Rs. 2.00

মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

13th March
2020
Special Issue

Vol : VIII Issue : XII, 13th, March, 2020 ফাল্গুন, ১৪২৬, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন-এর
১৩০তম জন্ম বার্ষিকী
এবং
বেথুন ইন্সটিটিউট-এর ষোড়শ
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

বিশেষ সংখ্যা

ভাষার হঠাৎ মৃত্যু হতেই পারে, যদি কোনও যুদ্ধে বা মড়কে সমস্ত ভাষাবক্তা উৎসন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়। সাধারণভাবে ভাষার মৃত্যু একটি ধীর ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রথমে ভাষা দুর্বল হতে থাকে, যখন ভাষার বক্তারা নিজের ভাষা ছেড়ে অন্য দাপুটে ভাষাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে থাকে, 'আমার ভাষাটা তেমন কোনও কাজের নয়, এ ভাষা নিয়ে আমি জীবনে খুব একটা দূর পৌঁছোতে পারব না'—এই রকম একটা ধারণা বেশিরভাগ বক্তার মনে তৈরি হয়। তার ভাষায় সে শিক্ষা পায় না, চাকরিতে ব্যবসাতে তার ব্যবহার সীমিত, দেশের রাজনৈতিক কাজ, প্রশাসন, আইন ইত্যাদি চলে অন্য কোনও দাপুটে ভাষায়, তখন সে এই রকম ভাবতেই পারে। বক্তারাই তখন নিজেদের ভাষাকে অবহেলা করতে থাকে। তাতে যত সাহিত্য থাক, সংগীত থাক, নিজস্ব জ্ঞান থাক—আধুনিক পৃথিবীর অর্থব্যবস্থায় তার স্থান সংকুচিত হয়ে আসে। ফলে সে ভাষা বক্তাদের নিজেদের কাছেই অবহেলিত হতে থাকে। অল্পবিপন্নতা থেকে সে ভাষা ক্রমশ চরম বিপন্নতায়, এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুতে পৌঁছে যায়।

এরই বিরুদ্ধে রীতিমতো সংগ্রাম শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর আশির বছরগুলি থেকে। 'এনডেনজার্ড ল্যাঙ্গুয়েজেস' সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী সচেতন হয়ে উঠেছে, এবং পশ্চিমেও বহু সমিতি গড়ে উঠেছে ওই সব ক্ষুদ্র ভাষাগুলির মৃত্যু প্রতিরোধের লক্ষ্য নিয়ে। ইউনেস্কো ভাষা এই বিপন্নটার নানা মাত্রা স্থির করেছে। কিছু ভাষা দুর্বল (vulnerable), কিছু ভাষা নিশ্চিতভাবেই বিপন্ন (definitely endangered), কিছু ভাষা তীব্রভাবে বিপন্ন (critically endangered), কিছু ভাষা মুমূর্ষু (moribund), আর কিছু ভাষা মৃত (extinct)।

এই সব বিপন্নতার নানা পর্যায় থাকে, এমনকি মৃত্যু থেকে ভাষাকে উদ্ধার করার নানা প্রকল্প ভাষাপরিকল্পকেরা হাতে নিয়েছেন। মৃত ভাষাকেও পুনর্জীবিত করা যায়, ইজরায়েলের হিব্রু ভাষা তার প্রমাণ। এমনকি ইংল্যান্ডের সেই মৃত কর্নিশ ভাষা, জাপানের আইনু, আমেরিকার হাওয়াইয়ান ইত্যাদি আরও নানা ভাষা নাকি আবার জীবন এবং বক্তা ফিরে পাচ্ছে—এই সুখবর আমরা পাচ্ছি। মৃত ভাষার যদি জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ভাষাকে তার মৃত্যুর আগেকার অন্যান্য অবস্থা থেকে কেন তুলে আনা যাবে না? তাই ভাষার পুনর্জীবন শুধু নয়, পুনরুজ্জীবনেরও (revitalization) চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টা কতটা সফল হবে তা নির্ভর করছে অনেক ঘটনার উপর। বক্তারা কতটা চায় তাদের ভাষা পুনর্জীবিত বা পুনরুজ্জীবিত হোক? তাদের চাওয়া আবার নির্ভর করে এই ভাষা তাদের যাপনে, শিক্ষাদীক্ষায়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উচ্চাশাপূরণে কতটা সহায়তা করতে পারবে তার উপর।

এমন হতেই পারে যে, 'সাফল্যে'র ভাষা শেখা ও ব্যবহারের পাশাপাশি তারা তাদের নিজেদের ভাষাও ছাড়তে চাইবে না। একাধিক ভাষা শেখা এবং তা নিয়ে কাজ করা মানুষের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তারা মাতৃভাষাকে চায় না, তখন ভাষার পুনরুজ্জীবনের কাজ কঠিন হয়ে যায়। ভরসার কথা এই যে, সব ভাষাতেই 'না-চাওয়া'র প্রবণতা কমছে।

বাংলার ক্ষেত্রে কি আমরা সেই কথা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি? একুশে ফেব্রুয়ারিতে সেই এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন।

তারই আর-এক পরম সার্থকতা ঘটল এই 'দিবস'-এর প্রতিষ্ঠায়। স্থানিক কণ্ঠস্বর, বাঙালির আর্ত ও ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, সমগ্র মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল। একই রকম আর্ত, ক্রুদ্ধ, প্রতিবাদী।

উঠল এমন এক সময়ে, যখন সমস্ত পৃথিবী মানুষের ভাষার 'মৃত্যু' নিয়ে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত। ওই ১৯৯৯ সালেই লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি অব আমেরিকার মুখপত্র 'এথনোলগ্' দেখিয়েছিল যে, পৃথিবীতে ৫১টি ভাষার বক্তা বেঁচে আছে মাত্র একজন করে, ৫০০ ভাষার বক্তা ১০০ জনের কম, ১০০০ ভাষার বক্তা ১০০০-এর বেশি নয়, ৩০০০ হাজার ভাষার বক্তা দশ হাজারের কাছাকাছি, আর ৫০০০ ভাষার বক্তা এক লক্ষের মতো। ভাষার সংখ্যাই যেখানে সাত হাজারের মতো, সেখানে এই হিসেব রীতিমতো আতঙ্কজনক। ভাষাবিজ্ঞানীরা এও অনুমান করেছেন যে, মানুষ যখন প্রথম ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করল (আজ থেকে আনুমানিক পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে), তখন মানুষের ভাষার যে সংখ্যা ছিল আজ তার অর্ধেক টিকে আছে, আর এই একবিংশ শতাব্দীতে তারও অর্ধেক বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর জীব বা উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের বিলোপের মতোই ভাষা বিলোপও মানবসভ্যতার এক চরম ক্ষতি। ভাষালোপের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় একটা গোষ্ঠীর সমস্ত জ্ঞান, স্মৃতি, সাহিত্য, সংগীত। এ তথ্য বহুলপ্রচারিত যে, ইংল্যান্ডের কর্নিশ ভাষার শেষ বক্ত্রী ডলি পেন্‌ট্রিথ মারা গেছেন ১৭৭৭ সালে, আর এই সেদিন ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি খবর বেরোল আন্দামানের 'বো' ভাষার শেষ বক্ত্রীও চলে গেছেন। মনে রাখতে হবে, একজন বক্তা থাকলেও ভাষা বেঁচে থাকে না, ভাষার কথোপকথনের জন্যে দুজনের দরকার হয়।

২

আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন তাই শুধু একটা শোক বা উৎসব পালন নয়, তা আমাদের প্রত্যেককে নিজের নিজের ভাষার দিকে চোখ না ফেরায়, যদি আমাদের ভাষাসংক্রান্ত আত্মজিজ্ঞাসায় উন্মুখ না করে তা হলে এ দিনটি আমাদের কাছে কোনও সার্থকথা পায় না, নেহাতই অনুষ্ঠান হিসেবে আসে এবং চলে যায়। নিজেদের ভাষা নিয়ে আমাদের প্রশ্নগুলি ঠিক কী হওয়া উচিত? বহু সম্ভাব্য প্রশ্নের মধ্যে থেকে কয়েকটিকে বেছে বলি, প্রথম প্রশ্ন : আমার ভাষার অবস্থান ঠিক কোথায়? সে কি নিজে বিপন্ন? হলে কতটা বিপন্ন, কোন্ কারণে (কোন্ কোন্ ভাষার দাপটে) বিপন্ন? আর যদি নিজে বিপন্ন না হয় (বা হয়ও), তারও দাপটে কি কোনও ভাষা বিপন্ন হচ্ছে?

হিসেব করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বেশির ভাগ বড় ভাষা, বিশেষত আগেকার সাম্রাজ্যবাদ এবং পরে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ পোষিত ভাষা অন্য অনেক ভাষার উপর দাপট দেখিয়েছে, এখনও দাপট দেখিয়ে চলেচে। এই সব ভাষার নিষ্ঠুর আধিপত্যে অনেক ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যে জন্য এগুলিকে killer language-ও বলা হয়, ভাষাধ্বংসের নাম কেউ কেউ (যেমন স্কুৎনাব কাঙ্গাস) দেন 'ল্যাঙ্গুয়েজ মার্ডার' বা ভাষাহত্যা। এই দাপুটে ভাষাগুলির মধ্যে আছে ইংরেজি, স্প্যানিশ, আরবি, রুশ, পোর্তুগিজ এবং আরও কিছু ভাষা। এখন হয়তো সকলে সমান দাপুটে নেই, ইংরেজি সকলের উপরে উঠে এসেছে। আর যেহেতু পৃথিবীর মাত্র ৪ শতাংশ লোক মোট চার হাজার ভাষা বলে, ওই সব ছোট ছোট ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলিই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন, তারাই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

—ঃঃ একুশে ফেব্রুয়ারির অর্থ ঃঃ—

পবিত্র সরকার

একটা হল নিছক ঘটনা—শাসকের পুলিশের গুলিতে কিছু মানুষের মৃত্যু, তার মধ্যে তরুণ ছাত্রও ছিল বেশ কয়েকজন। এই উপমহাদেশে গত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এ রকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে। স্বাধীনতার জন্য, বন্দিমুক্তির জন্য, অত্যাচার আর শোষণের প্রতিবাদে, খাদ্য বা ন্যায়বিচারের জন্য আন্দোলনে, কোনও জনস্বার্থবিরোধী ব্যবস্থা বা আইনের বিরুদ্ধে, কলকারখানার অবৈধ লক্‌আউট তোলার দাবিতে—মানুষের মিছিলের উপরে শাসকের পুলিশ গুলি চালিয়েছে বহুবার, তাতে বহু মানুষের মৃত্যুও ঘটেছে। কিন্তু ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার এই ঘটনাটার একটা নতুন অর্থ ছিল, যা তাকে আগেকার শাসকদের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডগুলি থেকে আলাদা করে দিয়েছিল। তা ঘটেছে আপাতদৃষ্টিতে একটি স্বাধীন দেশে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব অংশে—কিন্তু তখনই বোঝা যাচ্ছিল যে, পূর্ববঙ্গের জন্য ওই স্বাধীনতা এক প্রতারক চিহ্নমাত্র। তাকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের (৫৪ শতাংশ) ভাষাকে, বাংলাকে, উপেক্ষা করে একটি সংখ্যালঘু ভাষা (৭ শতাংশ) উর্দুকে তারা সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চায়। ১৯৪৮ সালের মার্চে পাকিস্তানের শ্রষ্টা মহম্মদ আলি জিন্নাহ-র প্রথম পূর্ববঙ্গ সফরে, তাঁর 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'—এই ঘোষণার পর থেকেই ছাত্রদের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারিতে তা এক তীব্রতার শীর্ষে পৌছোল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শোভাযাত্রায় পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে খুন হয়ে গেল, আব্দুস সালাম, রফিকউদ্দিন, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, সম্ভবত সালাউদ্দিন নামে আর-এক জন। পরিদন, ২২ তারিখে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল সফিউর রহমান আর ওহিউল্লাহ নামে এক ন-বছরের বালকের।

এখন ঐতিহাসিক পশ্চাৎপ্রক্ষেপে বোঝা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই আরম্ভ, বা আরম্ভের আগেকার আরম্ভ। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলাদেশের সীমানায় আবদ্ধ রইল না। সেই ঘটনা রইল না কেবল একটি জাতির ইতিহাসের ভূমিকম্পন হিসেবে। তার অর্থ ছড়িয়ে গেল মানব-অস্তিত্বের সর্বত্র। কারণ মানুষমাত্রেরই ভাষা আছে, আর এই ভাষা তার মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান। ভাষা দিয়েই তার সমস্ত যাপন, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি-প্রবেশ, কর্ম, অগ্রগতি, সংগ্রাম। এই ভাষাতেই তার সুখ-দুঃখ-ঘৃণা-ভয়ের সংবাদ, এই ভাষাতেই তার বিপুল সৌন্দর্যময় এক প্রকাশ—যার নাম সাহিত্য। অর্থাৎ ভাষা তার সবরকম মানবিক অস্তিত্বের সূত্র। কাজেই ভাষা যখন ব্যাহত, অপমানিত বা বিধ্বস্ত হয় তখন তার অস্তিত্বের শিকড় ধরে টান পড়ে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি (বা পরে সিলেটের উনিশে মে) শুধু কোনও স্থান বা সময়ে আবদ্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমগ্র মানুষের জন্য একটি প্রতীক হিসেবে গৃহীত হওয়ার মতো ঘটনা। শেষ পর্যন্ত এই স্বীকৃতি এল পৃথিবীর কাছ থেকে, ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে। যা ছিল নিছক পূর্ববঙ্গের ভাষা-সংগ্রাম, যার এক সার্থকতা অর্জিত হয়েছিল শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায়,

—ঃঃ বেথুন স্মরণ - আমাদের কর্তব্য ঃঃ—

ডাঃ মৃগেন গাঁতাইত

নর্মান বেথুন কর্মক্ষেত্রে একজন ডাক্তার ছিলেন। সেটা ছিল তাঁর পেশা। পেশার ক্ষেত্রে বেথুনের অনেক দক্ষতা ছিল; বিশেষতঃ যক্ষা রোগে বুকের অস্ত্রোপচারের নতুন যন্ত্রপাতি, পদ্ধতি ইত্যাদি আবিষ্কারের জন্য। পেশার দক্ষতা প্রয়োগ করতে গিয়েই বেথুন বুঝতে পারলেন যে, শুধু পেশাগত দক্ষতা দিয়ে মানুষকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয়। তাই শুরু করলেন মানুষের অসুস্থতার আরো গভীর কারণ খুঁজতে।

তাতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে মানুষের অসুস্থতার প্রধান কারণ হল দারিদ্র, যার মূল কারণ হল সমাজের মধ্যেকার আর্থিক বৈষম্য। আর এই বৈষম্য হল মুস্টিমেয় মানুষের অতীব মুনাফালিপ্সার ফল। অভাব দারিদ্র মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়, রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে তখন শরীরে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাও থাকে না।

বেথুনের তাই অনুভূতি হল যে, সমাজটার চিকিৎসা আগে করা দরকার। সামাজিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে পেশাগত দক্ষতা দিয়ে কোন কাজই ভালভাবে সম্পন্ন করা যায় না। বেথুন তাই চলে গেলেন সাধারণ মানুষের কাছে যারা সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগ্রামে লিপ্ত; কী স্পেন, কী চিন।

বেথুনের এই শিক্ষা তো আমাদের জন্যও প্রযোজ্য। যেমন, যত ভাল শিক্ষক হোন না কেন দরিদ্র ছাত্র, দুর্বল শরীর আর হতদরিদ্র স্কুলে কী ভালোভাবে পড়ানো সম্ভব! স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান কর্মস্থান না থাকলে খেটে খাওয়া মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হবেই, দেশের শ্রমশক্তি কমবেই। ডাক্তারি জ্ঞান তখন অসহায়। আর ডাক্তার যদি সামাজিক অবস্থাকে মাথায় না রেখে দরিদ্র রোগীকে দামী দামী ওষুধ, পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলে তাহলে রোগী কি চিকিৎসা চালাতে পারে!

আমাদের মনে রাখা উচিৎ আমরা সবাই সামাজিক জীব। সমাজের অবস্থাকে মাথায় না রেখে, তাকে উন্নত করার চেষ্টা না করে, আমরা কোন কাজই ভাল ভাবে করতে পারব না। পেশাগত মানুষের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক মানষ হয়ে উঠতেই হবে।

আমার বাক্স দুটো স্যানিটারি সার্ভিসের ডিরেক্টরকে দেবেন। অপারেশনের যন্ত্রগুলির মধ্যে আটটা পাবে ডাক্তার ইয়ো, আটটা ডাক্তার লিন ও আটটা ডাক্তার ফং। ইচ্ছে করলে মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার চিয়াং স্মৃচিতিহ্ন হিসেবে দুটো বেছে নিতে পারেন।

কম্বল দুটোর একটা দেবেন শৌ-কে, সে আমাকে দেখাশোনা করত, আর একটা চাং-কে, সে রান্না করত। শৌ-কে আমি আমার একজোড়া জাপানি জুতোও দিয়ে যাচ্ছি।

বছরে আমাদের আড়াইশ পাউন্ড কুইনাইন ও তিনশ পাউন্ড আয়রন কম্পাউন্ড দরকার। ম্যালেরিয়া ও অ্যানিমিয়ার জন্য এগুলো প্রয়োজন। পাও তিং, তিয়েনসিন ও পিপিং থেকে কখনো ওষুধপত্র কিনবেন না, সাংহাই ও হংকং-এ দাম অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। মিস হো আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছেন তার জন্য আমার হয়ে আপনি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। টি. বি.-কে আমার গভীর ভালবাসা জানাবেন। ভালবাসা জানাবেন আমার কানাডা ও আমেরিকার সমস্ত বন্ধুদের। বলবেন আমি খুব ভাল আছি। একমাত্র দুঃখ যে আরো বেশি কিছু করে যেতে পারলাম না।

জীবনের শেষ দুটো বছর আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খুবই অর্থবহ। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ লেগেছে, কিন্তু এখানে প্রিয় কমরেডদের মধ্যে আমি আমার চরম পাওয়া পেয়েছি।

আর কিছু লেখার মতো জোর পাচ্ছি না...আপনাকে ও আমার সমস্ত কমরেডদের প্রতি আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নর্মান বেথুন

চিঠিটা শেষ করে নর্মান ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লে, চিঠিটা হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে রইল।

বি.দ্র.ঃ- "মহাচীনের পথিক" থেকে সংগৃহীত (পৃষ্ঠা: ৩২৯-৩৩০)

—ঃঃ ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুনের একটি চিঠি ঃঃ—

ডাক্তার হেনরি নর্মান ছিলেন কানাডার অধিবাসী। জন্ম ৩ মার্চ, ১৮৯০। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রে ছিল পৃথিবীব্যাপী—ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, অস্ট্রেলিয়া, সুইটজারল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া ও চিন। তিনি চিনের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র নিয়ে জাপানি অধিকৃত এলাকায় বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে বেড়াতেন। দিনের পর দিন একনাগাড়ে আহত গেরিলা যোদ্ধাদের ক্ষিপ্রগতিতে অপারেশন করতেন। অপারেশন করতে করতে নিজের ছুরিতে তাঁর হাতের একটা আঙুল কেটে যায়। সামান্য ক্ষত, কিন্তু প্রয়োজনীয় ওষুধ না থাকায় সেই ক্ষত গ্যাংগ্রিন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ও রক্ত দূষিত হয়ে শত্রু পরিবৃত উত্তর-চিনের পার্বত্য এলাকার অখ্যাত এক গ্রামে ১৯৩৯ সালের ১৩ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে স্টাফ-হেড-কোয়ার্টারে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা ও নির্দেশ জানিয়ে এই চিঠি লিখেছিলেন।

প্রিয় জেনারেল নিয়ে,

আমি ভীষণ অসুস্থ। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কয়েকটা কাজের ব্যাপারে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

অনুগ্রহ করে টরেন্টোতে টি. বি.-কে আমার অবস্থা জানিয়ে একটা খবর দেবেন...নিউ ইয়র্কে চায়না এইড কাউন্সিলের কাছেও খবরটা জানিয়ে দেবেন। বলবেন আমি এখানে খুব ভাল ছিলাম, একমাত্র দুঃখ যে আরো বেশি কিছু করে যেতে পারলাম না।

আমি আমার জাপানি ও চিনা তরবারিগুলো নিউ ইয়র্কে বি-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি...

আমার সংগৃহীত সমস্ত ছবি, আমার যাবতীয় লেখা, ডায়েরি ও আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর তোলা তথ্যচিত্রটি টি. বি.-র কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ওকে জানিয়ে দেবেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই ফিল্মটির কাজ শেষ হয়ে যাবে।* আমার হয়ে আপনি চায়না এইড কাউন্সিলের কাছে অনুরোধ করবেন তারা যেন ফ্রান্সেসকে কিছু টাকা দেয়— একসঙ্গে না পারলে কিছু কিছু করে যেন দেয়। তাঁর প্রতি আমি আমার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না ও যেহেতু আমার টাকা নেই সেজন্য তাঁর সঙ্গে আমি আমার সম্পর্কও ছেদ করতে পারি না। ওঁকে বলবেন আমি খুব ভাল আছি।

আমার খাট দুটোর একটা আপনাকে, আরেকটা মিসেস নিয়ে-কে দিয়ে যাচ্ছি। দুজোড়া বিলিতি জুতোও আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। পাতলুন ও রাইডিং বুটগুলো জেনারেল লু-কে দিতে চাই। ডিভিশন কমান্ডার হো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর পছন্দমতো যে কোনো একটা জিনিস নিতে পারেন।

* সেটা কখনোই এসে পৌঁছয়নি।

আন্দোলনে সামিল হবার পর। আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে স্পেনে গৃহযুদ্ধে সেবা ও আন্দোলনে প্রয়োজনে এবং পরে চীনের লঙমার্চের আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করে এক নূতন রাস্তা খুলে দিলেন ডাঃ নর্মান হেনরী বেথুন। নিজে একজন শল্য চিকিৎসক হলেও লঙ মার্চে অংশ গ্রহণ করে লঙ মার্চের অবিস্মরণীয় সাফল্যে উদ্দিপিত করে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বেথুন। সেনাবাহিনী বলতো নর্মান বেথুন সঙ্গে আছে ভয় কি!

চলমান হাসপাতাল তৈরি করে রক্তের চাহিদা পূরণ করার জন্য নূতন নতুন পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি তৈরি করে এক নূতন রাস্তা খুলে দিলেন নর্মান বেথুন। বেথুন চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্লাড ব্যাঙ্কে চাহিদা পূরণের জন্য চলমান ব্যাঙ্ক তৈরি করেন এক নূতন পদ্ধতিতে—প্রমাণ করেন ইচ্ছাশক্তি আর দক্ষতা থাকলে সহজেই জয় করা যায় যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা।

ডাঃ বেথুন যুদ্ধক্ষেত্রেই চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজের আঙুল কাটার চিকিৎসা করার অবসরটুকুও নেননি। সেপটিক হয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। অমর হয়ে আছে ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন। তার জন্ম ১৮৯০ সালের ৩রা মার্চ। তার জন্মর পর ১৩০ বছর অতিবাহিত হয়েছে।

বেথুনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাকে উজ্জীবিত করার লক্ষে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের প্রতিষ্ঠান ষোল বছর অতিক্রম করল। আমাদের লক্ষ নর্মান বেথুনের প্রদর্শিত পথ দিয়েই আমরা এগিয়ে যাব বয়স্ক লোকেদের জড়ো করার মাধ্যমে। জনচেতনা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে জনসেবার যে আদর্শ নর্মান বেথুন দেখিয়ে গেছেন তাকে লক্ষ্য করেই আমরা এগিয়ে যাব এই বিশ্বাস রেখেই আমরা চলছি—চলব।

সকলে ভালো থাকুন।

শোষণ-পীড়ন চলছে। সংসারে প্রবীণ পিতা-মাতা বা পিতামহ-পিতামহী নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার সন্ধানে চলেছেন বৃদ্ধাবাসে। এই 'বৃদ্ধাবাস' ধারণাটি এসেছে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে। তাদের অনুকরণে এখন আমাদের দেশে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হতে চলেছে। সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতামাতার প্রতি কর্তব্য সারছেন দুরভাষের মাধ্যমে। এজন্য পাঠ্যসুচীতে সকল স্তরে প্রবীণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রবীণ-প্রবীণাদের সামাজিক অবস্থান জানবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন, প্রতিটি গ্রাম, শহর জুড়ে। এই সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পর উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রবীণদের অনেকেই ভালো অবস্থাতে নেই। তাঁদের অনেকেই নানাবিধ অত্যাচার ও বঞ্চনা সহ্য করে চলেছেন। বৃদ্ধাবাসে বৃদ্ধাবাসে যাঁরা রয়েছেন, তারা শরীর ও মনে কতটা ভালো আছেন তা সমীক্ষা করা প্রয়োজন। বৃদ্ধাবাসে বেসরকারী মালিকরা বিরটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে লাভজনক ব্যবসা করে থাকেন। এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে দেখা প্রয়োজন। যাতে এই শোষণ বন্ধ করা যায়। প্রবীণরা যাঁরা একদিন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধনে পরিবারের প্রধান ছিলেন, তাঁরাই আজ সংসারের অবহেলার পাত্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য কিন্তু তা ছিল না, পাশ্চাত্য দেশ অবাক হয়ে দেখত এখানে প্রবীণ-প্রবীণারা কতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়ে বাস করেন।

বর্তমানে চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি ও সমাজ পরিবর্তনের মধ্যে প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। মানুষের জীবন যাপনের মান যেভাবে উন্নত হচ্ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে চলেছে। এখন এই প্রবীণদের সংখ্যার সাথে তাদের সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে যদি সুপরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর না হওয়া যায়, আমাদের সমাজ এক বিরাট প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে।

~¥z² Ɨ̶ɑD 1; yeyeNational Policy on older person (1999); প্রবীণ মানুষের জন্য জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার; যদিও তার অধিকাংশ সুপারিশ কার্যে রূপায়িত করা হয়নি। এই নীতিতে প্রবীণদের সমস্যা সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপের কথা বলা হয়; জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রবীণরা যাতে শান্তিতে জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করতে পারেন সেই বিষয়ে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। এই জাতীয় নীতির রূপায়ণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। কারণ এই সমস্যার পরিধি অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মিলিত প্রচেষ্টায় এর পরিপূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব; একটি সুসংবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে।

সংক্ষিপ্তাকারে জাতীয় নীতির মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে—

ক) আর্থিক নিরাপত্তা সুরক্ষার ব্যবস্থা ঃ

১। বার্ধক্য ভাতা প্রদানের প্রকল্প বর্ধিত করা, বিশেষতঃ যাঁরা দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত, তাঁদের সকলকে প্রকল্পে স্থান দেওয়া একটি অন্যতম লক্ষ্য।

২। বার্ধক্য ভাতা প্রদান সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

—ঃঃ প্রবীণদের সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে পরিকল্পনা ঃঃ—

রমাপ্রসন্ন দত্ত

স্বাধীন দেশে ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। সারা ভারতে ২০০১ সালের জনগণনার হিসাব অনুযায়ী ৬০ বৎসরের উপর মানুষ ছিলেন ৭৫.৯৩ মিলিয়ন। যা সারা বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তর জনসংখ্যা, আর এই সংখ্যা বেড়ে ২০২১ সালে হবে প্রায় দ্বিগুণ। আর গড় আয়ু ১৯৪৭ সালে ছিল ৩২ বৎসর, বর্ত্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৭৩ বৎসর। এই ক্রমবর্ধমান প্রবীণ মানুষদের সুস্থ রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরও বিশাল চাপ দেখা যায়। ভারতের জলসংখ্যা ১৩০ কোটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে।

ষাটোর্দ্ধ মানুষের অনুপাত ভারতে ক্রমশ বাড়ছে ও বাড়বে।
১৯৬১ তে তাঁরা ছিলেন ৫.৬ শতাংশ
১৯৮১ তে তাঁরা ছিলেন ৬.৩ শতাংশ
২০০১ তে তাঁরা ছিলেন ৭.১ শতাংশ
২০২১ সালে হবেন ১১ শতাংশ

২০০১ সালের জনগণনার হিসাবে প্ররীণাদের আয়ু এক বছর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়; ফলে বাড়ছে প্রবীণা ও বিধবাদের অনুপাত। এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর এক অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এঁদের মধ্যে নিরক্ষর ও দরিদ্র। ফলে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে কাজ করতে হয় জীবিকা নির্বাহের জন্য। আমাদের দেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি। আর এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই একা অর্থাৎ বিধবা বা বিপত্নীক হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। ভোগেন একাকীত্বের যন্ত্রণায়। পুত্র, কন্যা, নাতী-নাতনীরা হয়ত দূরে বা বহুদূরে বিদেশে। এর মধ্যে অনেকে তাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়, আবার কারও ভাগ্যে জোটে পীড়ন ও অবহেলা।

কিন্তু স্বাধীনতার ছয় যুগ অতিক্রান্ত হলেও এখনও দেশের কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে অনেক কাজই বাকী। সুদীর্ঘ বৎসর পরও দেশের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা যায়নি। সমাজ থেকে দারিদ্র, জাতিভেদ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, সর্বোপরি শোষণ দূরীভূত করা আশু প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনা আমাদের মন ভারাক্রান্ত করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অনেক ক্ষেত্রে ১২ ঘণ্টা থেকে ১৮ ঘণ্টা খাটিয়ে নেওয়া হয়; যা কিনা একটা সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। এই বিশাল সমস্যার সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য হয়তো আর একটু যুগ অপেক্ষা করতে হবে।

বর্তমানে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে এক প্রজন্মগত ব্যবধান রচিত হয়েছে। প্রবীণগণ উত্তরসুরীর নিকট উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে একাকীত্ববোধ জন্মাচ্ছে। কোথাও বা

ফলে মাত্র দুহাজার সৈন্য নিয়ে বখতিয়াল খিলজি যখন নবদ্বীপ আক্রমণ করলেন (১২০২), লক্ষণ সেনের পালানো ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

এর পরবর্তীকালে বাংলায় লোকজন দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি ঘৃণায়। হজরত শাহ জালালের (১৩০৬-) মনত সুফীদের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে বাঙালি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে চোদ্দশ শতক পর্যন্ত। (শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মের আগে পর্যন্ত)।

তবে বাঙালির ইসলাম ও এক অদ্ভুত ধর্ম। বাঙালি মুসলমান আরবিক জানত না কোনদিন-ই বাংলাতে লেখা কোরান ছিল না এই উনবিংশ শতকেও। তারা মুসলমান হয়েছিল, নামে মাত্রই। অধিকাংশ বাংলা মুসলমান গৃহেই তাদের আদি ধর্ম এবং পার্বণের চল ছিল ষোল আনা। অনেক বাঙালি মুসলমান গৃহেই কালীপূজো হত এই সেদিনও। আমি নিজেই দেখেছি এরূপ অদ্ভুত জিনিস গ্রামে।

না - বাঙালি মুসলমানদের কোরান হাদিসে উৎসাহ ছিল না কোনদিনই। এর সব থেকে বড় উদাহরণ আরাকানের রাজসভায় প্রথম বাঙালী মুসলমান কবি (১৫৯৭-১৬৭৩) আলাউন। আলাউল বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যগ্রন্থের জন্য। তার বাকী কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বদিউজ্জামাল কাব্যগ্রন্থটি বাদ দিলে বাকীগুলি (সতী ময়না, সপ্ত পয়কর) সবগুলিই হিন্দু কাব্য কাহিনী থেকে নেওয়া।

আর সেই জন্যেই উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত একজনও বাঙালি মুসলমান পাওয়া গেল না যিনি কোরান বাংলায় অনুবাদ করতে উৎসাহী হবেন। বাংলায় কোরান অনুদিত হল। কিন্তু করলেন একজন ব্রাহ্ম। গিরীশ ভাই। কেশব চন্দ্র সেনের অনুরোধে। তাও তাকে যেতে হল লক্ষ্ণৌতে। কারণ বাংলাতে তিনি একজনও কোরান বিশারদ পণ্ডিত পেলেন না।

অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানরা নামেই মুসলমান ছিল - কোরানে কি আছে না আছে - এদের কেওই কোনদিন জানার চেষ্টাও করে নি। ফলে ইসলামটা অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানদের কাছে একটা ধর্মীয় আইডেন্টির বেশী কিছু ছিল না দীর্ঘদিন।

যাইহোক চৈতন্যের জন্মের আগেই অধিকাংশ বাঙালী নমঃ নমঃ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে গেলে যদিও তারা আদৌ জানত না কোরান হাদিস কি বা মহম্মদ কে ছিলেন! সবটাই যেটুকু সুফী ইসলামের ভাল ভাল গল্প উপদেশ তারা শুনতো - সেইটুকু ইসলামি লোকগাথাই ছিল তাদের ইসলাম।

—ঃঃ বঙ্গ-ভূখণ্ডে নি বাসী বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীদের ধর্মীয় ইতিহাস ঃঃ—

অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল

বল্লাল সেনের (1160-1179) আগে বাংলায় বৈদিক ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছিল না বাংলায়। অনেকে বলবেন প্রথম গৌড়ীয় রাজা শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। এই ব্যাপারটা গোলমেলে। এটা ঠিক শশাঙ্কের আমলের এবং তার আগের অনেক শৈব মূর্তি বাংলার মাটি খুঁড়লে এখনো ওঠে। আমি যেখানে থাকতাম সেখান থেকেও দেখতাম মাটির তলা থেকে প্রাচীন শৈব মূর্তি উদ্ধার হত। কিন্তু ইনি বৈদিক শিব নন। ঠিক যেমন মহেঞ্জোদারোর যোগী বৈদিক শিব নন। শিব আসলে উর্বরাশক্তির লিঙ্গ দেবতা এবং যোগী দেবতার শংকর। জায়গায় এর নানা ভ্যারিয়েশন। পরে ইনি বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ঢুকে যান। লিঙ্গ দেবতার ধারণা পৃথিবীর সব দেশের প্যাগানদের মধ্যে ছিল। মেসোপটেমিয়া থেকে রোম সর্বত্র লিঙ্গ দেবতার ধারণা ছিল। সুতরাং কোন লিঙ্গ দেবতাকেও পূজো করতো মানেই সে বৈদিক ধর্মের অনুসারী তা কিন্তু নয়। লিঙ্গদেবতার ধারণা সর্বব্যাপী।

বল্লাস সেনের আগে পাল রাজাদের আমলে বাংলাতে বৌদ্ধ এবং লোকায়ত অনেক ধর্মই ছিল - যার মধ্যে তান্ত্রিক, কালীভক্ত এবং নানান স্থানীয় প্যাগান সংস্কৃতিই পাওয়া যাবে। বৌদ্ধ ছিল রাজধর্ম। কিন্তু কোন জাতিভেদ পাওয়া যাবে না।

সেন রাজারা এসে প্রথমে বাংলার সব প্রজাদের শুদ্র বানাইলেন। কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণ ধরে এনে তাদের গ্রাম দিয়ে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৈদিক মতে পূজা অর্চনা চালু করলেন। ব্রাহ্মণদের বংশ বৃদ্ধি করতে এদেরকে অনেকগুলি গ্রাম দিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণদের অসংখ্য বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হল যাতে ব্রাহ্মণদের বংশ বৃদ্ধি হয়। এরাই আজকের চট্টোপাধ্যায় (যারা চিটাগঞ্জের কাছে গ্রাম পেয়েছিলেন) বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধ্যায়।

এক অদ্ভুত হিন্দু যুগের সূচনা হল বাংলায়। কিছু ব্রাহ্মণ। বাকী সবাই শুদ্র। বাংলাতে আজো ক্ষত্রিয় বৈশ্য নেই। বাংলার ব্যবসায়ী শ্রেণী সাহারাও শুদ্র আবার বোসের মতন রাজকরণিক শ্রেণীও শুদ্র!!

পাল্ রাজাদের আমলে যারা ধর্মীয় সাম্য উপভোগ করছিলেন, তারা হঠাৎ করে বর্ণহিন্দুর এই শুদ্র স্ট্যাটাসটা মানবেন কেন? না। বাংলা কখনোই সেন রাজাদের মেনে নেয় নি। বল্লাল সেনের আমলে তার এই জোর করে-ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম চাপানোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় চারিদিকে। এর মধ্যে বিখ্যাত ছিল বর্ধমানের কৃষক-জেলে বিদ্রোহ। সুন্দরবন এলাকাতে বিদ্রোহ করেন কোম্মপাল (১১৯৬)। তিনি সুন্দরবন এলাকাতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে লক্ষ্মণ সেন, বাংলার শুদ্রদের মধ্যে ২৭ টি কাস্টকে উত্তমর্ণ শুদ্র স্ট্যাটাস দিলেন। কিন্তু তাতে কি আর শেষ রক্ষা হয়? বাংলার জ নগণ তখন এই বহিরাগত ব্রাহ্মণ আর সেনদের প্রতি বেজায় বিক্ষুব্ধ।

এই গান গাওয়ার অপরাধে জোটে পুলিশের বেত্রাঘাত ও পদাঘাত। ভাষার আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। এর পরেও তিনি ভাষা-শহীদদের স্মৃতিতে গান রচনা করেন। ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ এবং ১৫ মার্চ তিনি এই গান দুটি লেখেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন ও সমাদৃত হন।

আমার এই মাতৃবুলি
সুর ও ছন্দে বলিহারি
হৃদয়পত্রে সোনার তুলি।।
রূপালি চাঁদের জোছ্না নিয়ে
ফুলের পরাগ বিনিয়ে বিনিয়ে
সাম্যরসের সুধা দিয়ে
ভিজিয়ে গেছে পথের ধুলি।।
চপন মেয়ের বাক্‌চাতুরি
কর্ণরন্ধ্রে বেড়ায় ঘুরি
ফুলের তোড়া মারলো ছুঁড়ি
দোল-পূর্ণিমায় আবির গুলি।।
শিশুমুখে আধফোটা বোল
বাংলা মায়ের সুমিষ্ঠ কোল
পূবাল সুরে পরাণ পাগল
মহিম বলে কেমনে ভুলি।।

মিষ্টি আমার মায়ের ভাষা
শিখিয়েছি মার কোলে বসি
কেমন মধুর কেমন খাসা।।
পায়ে পায়ে আসিয়া হেঁটে
মায়ের চরণ ধরেছি এঁটে
মায়ের বক্ষ-সুধা চেটে চেটে
আমি মিটিয়েছি মন-আশা।।
আমার মাকে আমি ভালোবাসি
মা-মা বলে কাঁদি ও হাসি
নয়নজলে সতত ভাসি
মায়ের বুকে না পেলে বাসা।।
জননী মোর বাংলার মাটি
কতই সুন্দর কতই খাঁটি
নব দূর্বাদলে শীতলবাটি
মহির সবার চেয়ে ভালোবাসা।।

এরপর সাধন তত্ত্বের গানে তিনি নিমগ্ন হলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসা থেকেই যায়। বহুদিন পর ১৯৭৮ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে ফরিদপুরে বসে একটি গান রচনা করেন।

কি জাদু এই বাংলা গানে আ-মরি মরি।
ছন্দরসে মধুমাখা মন নিল রে হরি।।
বাজে প্রেমজুড়ি-একতারা
নাচে গায় বাউল-নাড়া
উদারা-মুদারা-তারা
এক সুরে রাখিছে ধরি।।
রাখাল মাঠে বাজায় বাঁশি
নায়ের মাঝি গায় বারোমাসি
জল নিতে বউ ঘাটে আসি'
কলসি-ভরা গেল পাশরি।।
পল্লিগাথা আর গীতিরসে
চঞ্চল শিশু মন-হরষে
মায়ের আদুরে কর-পরশে
ফুল-বিছানায় ঘুমায় পড়ি।।

ভাষা আন্দোলনে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত নাগরিকবৃন্দের কথা—বিদ্রোহী ছাত্রদলের কথা বহু-আলোচিত এবং আমরা প্রায় সবাই জানি। কিন্তু সহজিয়া পথের মরমি সাধক বাউলের একতারাও যে দ্রোহের গান—প্রতিবাদের গান—শ্রেণিচেতনার গান—শ্বেতশুভ্র সুন্দর জীবনের গান হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল প্রতীক ফকির মহিন শাহ। কৃতজ্ঞ চিত্তে ও শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করি।

তথ্যঋণ ঃ ভাষা-আন্দোলনের দলিল ও অন্যান্য—আবুল আহসান চৌধুরী।

—ঃঃ বাংলা ভাষা-আন্দোলনে সাধক-বাউল মহিন শাহ ঃঃ—

সঙ্কলনে—অশোক রঞ্জন ধর

সাধক ফকির মহিন শাহ (১৩১০—১৪০৩ বঙ্গাব্দ) সমকালীন বাউল কবিদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। ১৩১০ সালের আশ্বিন মাসে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার হরিরামপুর থানার হরিহরদিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মঙ্গল শাহ ছিলেন একজন দীক্ষিত ফকির। ১৩৩৬ সালে শিলেকাটা গ্রামের সূর্যবানুর সঙ্গে বিবাহ হয়। প্রথমার মৃত্যুর পর ১৩৫১ সালে তাঁর জীবনে আসে কলাকোপা গ্রামের জোছনা বেগম। ১৩৬৭ সালে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও দেহ রাখেন। মহিন শাহ সংসারের বন্ধন ছিন্ন করে পথে নামেন। তিনি দেহত্যাগ করেন ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ ফরিদপুরে এবং তাঁর শেষশয্যা রচিত হয় ছেঁউরিয়ার লালন সাঁইয়ের ধামে।

মহিন শাহ ছিলেন একজন তত্ত্বজ্ঞ সাধক, বিশিষ্ট বাউল পদকর্তা ও নামী গায়ক। কবি জসীমউদ্দীনের সাহচর্যে তিনি গান রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর গান সাধক ও রসিক শ্রোতাদের নিকট খুবই আদৃত। মহিন শাহের পোশাকি নাম মহিউদ্দীন আহমেদ। তবে তিনি মহিন রাজা, মন-মহিন, মহিন বাঙ্গাল, মহিম শাহ—প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। গানের ভণিতাতেও এইসব নাম ব্যবহার করেছেন।

সমকালীন ঘটনা মহিম শাহকে গভীরভাবে নাড়া দিত। ইংরেজ আমলে চারণকবি মুকুন্দ দাসের গানে অনুপ্রাণিত হয়ে ও স্বদেশিদের সাহচর্যে তিনি বেশ কিছু উদ্দীপনামূলক গান লেখেন। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানবপ্রেমী বাউল সাধক হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময় সম্প্রদায় সম্প্রীতির গান বেঁধে চারণের মতো গ্রামে গ্রামে সেই গান গেয়ে ফিরেছেন। দেশভাগের পর তাঁর সাহসী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"পাকিস্তান না পাপীস্তান ভাই বুঝিতে পারি না
কইতে গেলে মনের কথা প্রাণে বাঁচি না।।"

একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধে তিনি রচনা করেন—

"বাংলা মায়ের দামাল ছেলে আয়রে ছুটে আয়রে আয়
মায়ের ভরম রাখিতে মরণ ভাল যদি হয়েই যায়।"

কবি জসীমউদ্দীনের অনুপ্রেরণায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ একটি গান লেখেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি রমনা পার্ক থেকে শুরু করে একটি সারিন্দা সহযোগে ঢাকা শহরের মোড়ে মোড়ে গানটি গেয়ে চলেন—

আ-মরি বাংলা ভাষা
মা বোলা ডাক মধুর লাগে
মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে
মা-মা বলে পুলক জাগে।।
বাংলা মা-কে ভালোবাসি
পল্লিবালার কল-হাসি
মেঠো সুরে বাজে বাঁশি
মুকুল-ঝরা কুসুমবাগে।।

মন পাগল বাউলগানে
সুরের মিলন একতারাতে
ধানের ক্ষেতে খুশির মাতন
শাওন-বাদল বান-ধারাতে
মা জননী বঙ্গভূমি
তোমার যুগল চরণ চুমি
সাত-রাজার ধন মানিক তুমি
পথের ধূলা অমল ফাগে।।

তাদের কার্যকলাপ সবই দেখা যাচ্ছে। আর ওখানে কুলিক নদীর খাঁড়ি আছে তাতে ব্রীজ আছে সেখানে ম্যানগ্রোভ, হেতাল ও সুন্দরী গাছ লাগানো আছে। কচ্ছপ, হাঁস ইত্যাদি জলে চড়ে বেড়াচ্ছে। অনেক রাজহাঁস ও ময়ূরও আছে।

এই ভ্রমণ সর্বাধিক ভালো লেগেছে আমার। এবার বালুরঘাটের ইতিহাস হয়তো আপনারা জানেন। কিন্তু সকলেই তো জানেন না। এই শহর পূর্বে পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত ছিল। ১৯১৪ সালে জেলার প্রশাসনের কাজ এবং উন্নয়নের জন্য উক্ত জেলাকে দুইভাগে ভাগ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর হয়েছে। বালুরঘাট শহরটি দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রধান, সংস্কৃতিপরায়ণ ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রাণকেন্দ্র। এই শহর বহু বছর থেকেই 'বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতি পরায়ণ। সুতরাং ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি সাহিত্যিক, নাট্যকার সহ এমন কী রাজ্যের বহু মন্ত্রীরও এই শহরেই জন্ম। কিন্তু এখানে স্বাধীনতা লাভ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের একদিন পরে ঘোষিত হয়েছে। তাই পরে তারা স্বাধীনতা উৎসব পালন করেছে। বালুরঘাটের রাস্তার নাম কোন কোন অঞ্চলের নাম এমনকি কোন কোন পূজা প্যান্ডেলের নামও কলকাতার সঙ্গে মিল আছে। আত্রেয়ীর ঘাটে যে পূজা নিরঞ্জন হচ্ছে তাও কলকাতার মতোই নিয়মশৃঙ্খলায় মোড়া। তাই আমি একে এক টুকরো কলকাতাই বলবো।

একটু একটু করে এগোতে লাগলাম। রাস্তা বাঁধানো, কিন্তু ক্রমশ নীচ থেকে উপরে উঠছে। আর ডানদিকেও বাঁদিকে কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট উঁচু উঁচু গাছের ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আকাশ একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার ডানদিকে গাছের পর উঁচু প্রাচীরের পাশে জাতীয় সড়ক থাকলেও কিছু দেখা যায় না। আর বাঁদিকে গভীর জঙ্গল তাল-তমাল, কদম, শাল-পিয়াল ক্ষিরিশ, আম-জাম, পেয়ারা, অর্জুন ইত্যাদি গাছের পাশেই রয়েছে বিরাট জলাশয়। ঐ জলের উপরে আবার কোথায়ও ব্রীজ করা আছে স্টাফদের যাতায়াতের জন্য। কিন্তু পর্যটকরা সে পথে যেতে পারে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঠি ঠুকতে ঠুকতে জঙ্গলের সিকিউরিটি গার্ডের দেখা পাওয়া গেল। গা-ছমছম করা পরিবেশে আমার গলা জড়িয়ে আসতে লাগল। তাও সাহস করে দূর থেকে তাকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে কোন বসার জায়গা নেই? সে উত্তর দিল আপনাকে আরেকটু এগিয়ে আসতে হবে, তাহলে অনেক বসার জায়গা পাবেন। তার কথামতো রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে দেখলাম আর একটা রাস্তা একটু উপরে উঠে উত্তর থেকে দক্ষিণে সোজা চলে গেছে। আমি একদম দক্ষিণ প্রান্তে ছিলাম। ওখানে কয়েকটি গাছের গুঁড়ি কেটে বসার ব্যবস্থা করা আছে। তাতে বসতে গিয়ে দেখি নানা রঙের নানা আকারের পিপীলিকা জাতীয় প্রাণী গায়ে পায়ে বাইতে ও কামড়াতে লাগলো। তাড়াতাড়ি উঠে ঝেড়ে তাদের দূর করে ক্ষতস্থানে নিজের থুথু ছিটাতে কিছুক্ষণের মধ্যে জালাপোড়া বন্ধ হয়ে গেল। সামনে এগিয়ে দেখি কুলিক নদী বয়ে চলেছে দুপাড়ে প্রাচীন দেওয়া আছে। আছে নদীর পাড়ে অসংখ্য গাছ গাছালি। আর দূরে তাকালে দেখা যাচ্ছে জনবসতি ও চাষের মাঠ। যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম সহকারে সিকিউরিটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে পারবো। সে বলল আপনি আর একটু এগিয়ে বাঁদিকে সমান্তরাল রাস্তা করা আছে তার পাশে জলের ট্যাঙ্ক আছে সেই রাস্তা ধরে আবার জঙ্গলে প্রবেশ করে সোজা গেলেই আমি জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবো। তার কথা মতো আমি চলতে লাগলাম। সেখানে প্রথমেই চোখে পড়লো একটা বড়ো অংশ জুড়ে একটা পাখির বাড়ি করা আছে। দোতলা বাড়ি। সেখানে অনেক রঙবেরঙের দেশি বিদেশী পাখির থাকার জায়গা। আরও কিছুটা ভিতরে ঢুকে দুপাশে সেই বড় বড় গাছে একসঙ্গে বারোটা থেকে পনেরটার বেশি বাসা বেঁধে শামুখ পাখিরা পরম সুখে সংসার করছে। আপনাদের লিখে আমি হয়তো বোঝাতে পারবো না। জঙ্গলে আমার ঐ উপস্থিতিতে বনের সমস্ত পাখি যেন আনন্দে উদ্‌বেলিত হয়ে একসঙ্গে বেশি কিছুক্ষণ ধরে নানা কণ্ঠস্বরে হর্ষধ্বনি দিতে লাগলো। সেই অনুভূতির কথা আমি আমৃত্যু মনে রাখবো। এদিকে আমাকে না আসতে দেখে আমার স্বামী খানিকটা ভয়ে ঘাবড়ে গেছেন। সে কথা আমি জানতে পারলাম এ্যাকোরিয়মের ঘরে মাছ দেখতে গিয়ে। ওখানকার ভারপ্রাপ্ত ছেলেটি আমাকে বললো কাকিমা আপনার সঙ্গে কি কেউ এসেছিল? আমি বললাম তার চেহারার বর্ণনা সে কোথায় আছে জানো বাবা? সে বললো কাকুর শরীর খারাপ লাগছিল বলে আমরা ওনাকে জল দিয়ে কমিউনিটি হলে বিশ্রাম করার জন্য বসিয়ে রেখে এসেছি। আমি ওকে বললাম যে রাস্তাটি দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় সেখান দিয়ে আমাকে একটু নিয়ে যাবে। ছেলেটি খুবই ভালো ছিল। ও আমাকে সামনের একটা দরজা খুলে তাড়াতাড়ি সেপথ দিয়ে নিয়ে এল। ঐ হলে যেতে সর্বোচ্চ ওয়াচ টাওয়ার ডানদিকে আছে। সেখান থেকে পাখিদের কার্যকলাপ সুন্দরভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমাদের কারোর পক্ষে ঐ টাওয়ারে ওঠা একেবারেই অসম্ভব। আর ঐ হলে বিরাট স্ক্রীনে পাখির নানা প্রজাতির নাম ও

বালুরঘাটের মানুষগুলির সঙ্গে চলেফিরে এবং অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে মিশে মনে হল মানুষগুলিতো এখনও মানুষই আছে। মানুষরূপী চারপেয়ীতে পরিণত হয়নি এখনও প্রত্যেকেই বেশ ভালো মানুষ বলেই মনে হল বার বার। কোন তঞ্চকতা, বা উপর চালাকি অথবা কোন উগ্র সাজ-গোজ বা হীনমন্যতায় ভোগে না কেউই। সকলেই যেন সদালাপী।

এরপর আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় বালুরঘাটের সীমান্ত এলাকা হিলিতে, পাঁতিরামে এস্টেটে ও শিব মন্দিরে এবং সর্বশেষ বালুরঘাটের উত্তরে রায়গঞ্জে কুলিক পাখিরালয় দেখতে গেলাম। এই পাখিরালয় দেখার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। এখানে দেশি-বিদেশী বহু পাখির আগমন ঘটে গাছে গাছে। সম্ভবত আমরা ৮ই অক্টোবর ভোরবেলা উঠে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রথম সরকারী বাস ধরে শিলিগুড়ি মোড়ে নামলাম। তারপর আমরা একটা অটো ধরে মাত্র দশটাকা ভাড়া। কাছেই তো তাই। দেখতে পেলাম রাস্তার উপরেই লেখা আছে কুলিক পাখিরালয়। ডানদিকে বড় গেট করা আছে। আর উল্টোদিকে আছে কুলিক অতিথি আবাস। আমরা ঠিক করলাম যে আমরা সারাদিন দেখে বাড়ি ফিরে আসবো। বেশ কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত কুলিক নদীর ধারে বড় সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই পাখিরালয়। তার কোন সীমানা চোখের এক দৃষ্টিতে আসে না।

এবার জনপ্রতি চল্লিশ টাকার টিকিট কেটে ওখানকার একজন স্টাফের কথায় ডানদিকের শেষ রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম। কিছুটা এগোবার পর আমরা লক্ষ্য করলাম যে ভিতরে গভীর জঙ্গল, জলাশয়, খাঁড়ি ইত্যাদি রয়েছে। আর গাছে গাছে অসংখ্য শামুকখোল পাখির বাসা। তারা ছানাদের নিয়ে পরম সুখে বাসায় খাওয়া-দাওয়া খেলাধূলার পর্ব সারছে। কিছুটা এগিয়ে দেখি ঐ বিশাল রাস্তায় ডানে-বায়ে কোন খেলাধূলার, বসার বা বিশ্রামাগার নেই। ফলে আমাদের দম প্রায় হয়ে এলো তখন আমার স্বামী রাস্তায়ই বসে পড়ে বললেন যে তার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয়। আমি বললাম ঐ গাছের গায়ে একটু ঠেস দিয়ে আবার চলো। কিন্তু আর পারলেন না। উনি ফিরে এসে ঐ অফিস কাউন্টারের সামনে বসে পড়লেন। ওখানকার স্টাফরা ওনাকে জল খাইয়ে এবং এক বোতল জল দিয়ে কমিউনিটি হলে (এসি) বসিয়ে রাখলেন। এদিকে আমি ঠিক করলাম এটা দেখবো বলেই তো এলাম, তাহলে যাই হোক এটা দেখেই যাবো। সুতরাং আরও কিছুটা এগিয়ে দেখি যে আমিও তো পারছি না তাহলে কী হবে? এদিকে ভেতরে কোন লোকও দেখতে পারছি না বা বসারও কোন জায়গা নেই। আর বন-জঙ্গলে শুধু যে পাখি থাকে তা নয়, নাম না জানা বহু রকমের কীটপতঙ্গ থাকে। সেগুলিও মানুষের পদচারণের গায়ে-পায়ে এসে পড়ছে ও দংশন করছে। এবার তো মনে হচ্ছে লুটিয়ে পড়েই যাবো। তাই মনে কিছুটা সাহস নিয়ে বাঁদিকে একটা বড় গাছের পরিস্কার কাণ্ড দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি প্রথমে দুজন এবং পরে আরো একজন লোক বনের ভিতরে প্রবেশ করলো। তাদের বয়স যথেষ্ট কম থাকায় তারা না থেমেই তরতর করে এগোতে লাগলো। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে আমার সঙ্গে আর কেউ আছে কিনা, আমি বললাম হ্যাঁ। আমার সঙ্গে আমার স্বামী আছেন, কিন্তু উনি আর হাঁটতে পারছেন না। তাই ফিরে গেছেন এবং বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ দম নিয়ে আমি আবার অতি কষ্টে

—ঃঃ এক টুকরো কলকাতা ঃঃ—

ছায়া মুখোপাধ্যায়

"হেথা নয় হোথা নয় অন্য কোনখানে" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় সব মানুষেরই মন ছুটে বেড়ায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। তাই আমরা অর্থাৎ আমি এবং আমার স্বামী স্থির করলাম এবারের পূজায় বালুরঘাটকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুরে আমরা ঘুরতে যাব। ছোটবেলা থেকেই বালুরঘাট শহরের নামটার সাথে আমি বিশেষভাবে জড়িয়ে আছি। আমাদের কিছু আত্মীয় স্বজনও ওখানে থাকতেন।

১লা অক্টোবর ২০১৯ ভোরবেলা উঠে হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সকাল ৬-৩০ টায় হাওড়া স্টেশনে। ট্রেন যথারীতি যথাসময়ে ছুটতে শুরু করলো গন্তব্যপথে। হাওড়া হুগলি ছাড়াতে শুরু করার পর থেকে রাস্তার দুধারে নানা রকমের ডিজাইন করা কাশফুলের সারি যেন হাসিমুখে সমস্ত যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছে। অপূর্ব সেই দৃশ্য চোখের ঘুম যেন অদৃশ্য হয়ে গেল ঐ দৃশ্য দেখার আকর্ষণে। ঠিক তারপর থেকেই যতদূর চোখ যায় দুপাশে বিস্তৃত ধান ক্ষেত। আর অতি বৃষ্টি ও গঙ্গা, মহানদী অন্যান্য নদীতে জলস্ফীতি হওয়ায় মালদার চাষের জমি ও বড় বড় গাছ গাছালি এবং আম বাগান পুরো জলে ডুবে ছিল। তারপর থেকে যত এগোচ্ছি তত জলের আধিক্য বেশ কিছুটা কম এবং দুপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। চোখ ফেরানো যায় না।

ঠিক ঘড়ির কাঁটায় সন্ধ্যা ৬-২৫ এ ট্রেন থামল বালুরঘাট স্টেশনে। স্টেশনে নেমেই ফোনে পেলাম ওখানকার প্রবীণ নাগরিক দায়িত্বশীল মানুষের। আমরা খানিক এগোতেই রায়বর্মনবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমাদের লাগেজগুলি নিয়ে নিলেন। ওনার সঙ্গে ছিলেন সিক্‌দারবাবুও। স্টেশনের বাইরের পথে সিঁড়ি ছাড়াও র‍্যাম্পের ব্যবস্থা ছিল। ফলে আমাদের খুব সুবিধা হল। ওনারা আমাদের সোজা অতিথিশালা ক্ষণিকার সামনে নিয়ে গেলেন। আর আমাদের কাছের দোকনে চা খাওয়ালেন। এবার ক্ষণিকা থেকে সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামী ওনাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। আর রাতের খাবারের জন্য কোন এক হোটেলে আমাদের আবাসে রুটি সব্‌জি ডেলিভারী দেওয়ার ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে গেলেন। যথারীতি রাত ৯-৩০ টায় খাবার চলে এলো। আমরা ঐ ব্যক্তিকে মূল্য দিয়ে দিলাম। পরের দিন আমার বন্ধুর বোনের বাড়ি থেকে খুব ভোর বেলা ফোন এলো এবং আমাদের নাট্যকার প্রদোষ মিত্র-র বাড়ি গাড়ি করে নিয়ে বিশাল জলখাবারের আয়োজন করলেন। আমরা কিছুটা খেয়ে ও-বাড়ির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতেই বেরিয়ে পড়লাম বালুরঘাটের একেবারে দক্ষিণে প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকা পরিদর্শনে। প্রবীণ নাগরিকদের সহযোগিতায় তাদের গাড়ি করে এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। প্রায় আদিসার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। ওখানকার গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও ক্ষেতচাষ, পিকনিক স্পট সহ সবুজ নানা গাছের সমাহারে মন সতেজ হয়ে উঠল। পথে ওনাদের সৌজন্যে একটা দোকানে বসে গরম গরম ঝুরিভাজা ও চা পান করলাম।

আপনার নিঃসঙ্গতাকে এরা ভেঙে খান খান করে দেবে। নিঃসঙ্গতার অভিশাপ জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলোর কাছে পরাভূত হয়ে যায়। আমি এখনও বুঝি না মানুষ কেন নিঃসঙ্গতাকে এত ভয় পায়? পৃথিবীতে কত না সম্পদ আর গুপ্ত ধন আছে জীবনকে পূর্ণ করার জন্য। যদিও জীবনে মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতা আসতেই পারে নিঃসন্দেহে কিন্তু ওটা চলেও যায়।

'আড্ডা' একটা বাড়তি আকর্ষণ আমাদের জীবনে। আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়ের সঙ্গে মজা করে কথা বলুন, তাঁদের কথাও শুনুন। এক একজন আড্ডাবাজদের শিরোমণি হয়ে থাকেন। 'আড্ডা' হলো প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনের সঞ্জীবনী। সমস্ত দুঃখবেদনা আর নিকৃষ্ট নিঃসঙ্গতা মুহূর্তের মধ্যে ভ্যানিস হয়ে যায়। অলস গ্রামজীবনে বলুন আর ব্যস্ত নগরজীবনে বলুন ভারতীয়দের জীবনে আড্ডা অতি সাধারণ ঘটনা। এই যে বাংলা শব্দ আড্ডা' - অক্সফোর্ড ডিক্সনারীতেও স্থান পেয়েছে। তাহলে দেখুন কতখানি গুরুত্ব আড্ডার। মানুষ আমাকে একটা অদ্ভুত 'বকবকানি'র শিরোমনি মনে করে। আমি আড্ডার আসরে হয়ে উঠি মধ্যমণি—এটাই জীবনে আনন্দের ঝরনাধারা।

আমার ধারণা, নিঃসঙ্গতা তাড়ানোর ক্ষেত্রে পোষা জীবজন্তু-পাখি, বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, সুন্দর সুন্দর পাখি দেখার জন্য পার্কে বা বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, অঙ্কন বা পেন্টিং, ক্যামেরার চোখে বিশ্বকে দেখা, উত্তেজনাময় ভ্রমণ, ফিলাটেলি অর্থাৎ ডাকটিকিট সংগ্রহ, সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা কার্ড সংগ্রহ, কয়েন বা মুদ্রা সংগ্রহ, সমাজসেবা, বেশ গাছাগাছালি ভরা স্থানে পিকনিক করা, বা মাছ ধরার সখ (অবশ্য তার জন্য ধৈর্য্য চাই), বাগান করা, টিভি দেখা, সমুদ্র সৈকতে সময়কাটানো, বা পাহাড়ে চড়া, কিম্বা শুধুই কর্মহীন একাকি সময় উপভোগ করা, কিম বা বিসমিল্লা খাঁর শানাই শোনা, নীল ডায়মণ্ডের গান শোনা—"I will be what I am, Solitary Man"—এমন কত কী বিষয় আছে—আপনি একবার ভেবে দেখুন। আপনার চারপাশে অজস্র গুপ্তধন আছে এগুলি দিয়ে আপনার জীবনপাত্র ছাপিয়ে যাবে। আপনার অর্থের অভাব?—গ্রাম সমীক্ষা করুন। দারিদ্র্য কোনো অজুহাত হতে পারে না। এমনকি কিছু উপার্জনের চেষ্টা করলে আপনার সময় ব্যস্ততায় ভরে উঠবে, নিঃসঙ্গতা পালাবে। অবসরপ্রাপ্ত মানুষের উৎকৃষ্ট সঙ্গী বই আর আড্ডা। অতএব আপনি বেছে নিন পরিপূর্ণ আনন্দময় জীবন। সাহসের সঙ্গে যুঝতে থাকুন।

এর পরেও নিঃসঙ্গতা আপনার পিছু ধাওয়া করছে? কিন্তু আপনার পোষা পাখি জীবজন্তু আপনার সময়কে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আপনি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে, মুদ্রা সংগ্রহ করে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন। আপনার এই বিশেষ ধরণের জীবনই হল সভ্যতার সীলমোহর। আপনার সিনেমা দেখার আনন্দ, গান শোনার মুহূত:গুলো আপনাকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। আপনি সামর্থ্য থাকলে দুনিয়া ঘুরে বেড়ান। আপনার সৃজনশীলতা থাকলে তো কথা নেই, লেখকরা সবসময় নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় উজ্জীবিত থাকেন। এর পরেও আপনার নিঃসঙ্গতা পিছু ছাড়ছে না? তাহলে আপনি মনে হয় অসুস্থ এবং জীবনে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাহলে যথাশীঘ্র একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান। কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়বেন না। সুখের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান?। [সংক্ষেপিত])

আপনার বালিশে নীচে রাখুন। ঠিক আপনার হৃদয়টির পাশেই। তবে মধ্যরাত্রি হলো গান শোনার পক্ষে আদর্শ, আপনার স্লিপিং পিল লাগবে না। যদি নিদ্রাহীনতার রুগী না হন তাহলে গ্যারান্টি দিতে পারি, আপনি গবীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হবেনই। সকালে আপনি ঝরঝরে তাজা মুড নিয়ে জেগে উঠবেন।

বিকেলের অলস মুহূর্তে আপনার পুরোনো অ্যালবামগুলো খুলে দেখতে দেখতে আপনার সময় কীভাবে কেটে যাবে আপনি জানতে পারবেন না। স্মৃতির দুয়ার খুলে একটা লম্বা দৌড় হয়ে যাবে আপনার। আপনার ডাকটিকিটের অ্যালবামটা খুলে দেখুন আপনি প্রচুর আনন্দ পাবেন। কিন্তু যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে আপনার লতাবিতানে জলসিঞ্চন কুরন। আপনি কিছু লেখালেখি করতে পারেন যে-সব স্মৃতিময় বিষয়গুলো লেখালেখির মাধ্যমে নাড়াচাড়া করতে আপনার ভালো লাগবে। আমি প্রায়শই মিটিং বা সেমিনারে যাই। সেখানে আমাকে প্রধান অতিথি বা সভাপতির আসনে বসানো হয়। কিন্তু এসব সম্মান আমার চাই না। আমি চড়া গলায় কুসংস্কার, করাপশান, সরকারের বা প্রশাসনের অপদার্থতা, বহুবিবাহ এবং একপক্ষীয় তালাকের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করি। কিন্তু একটা মিটিং ইটিং ছাড়া কি হতে পারে? সুতরাং শ্রোতা চা কিম্বা কফিতে গলা ভেজায় আর আমার বক্তব্য শোনেন। একাকী মানুষ প্রফেসর অম্লান দত্ত ছিলেন একজন মহান চিন্তাবিদ। আমার মতে তিনি একজন উদাসীন (philosopher) দার্শনিক ছিলেন। একাই জীবন যাপন করতেন তিনি। তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন এবং এভাবে সুখের সন্ধান পেতেন। তাঁর প্রয়াণ ঘটে ২০১০-এর ১২ ফেব্রুয়ারি। অনেকদিন মৃতদের সঙ্গে কাটিয়েছি লাইব্রেরীতে রবার্ট সাউদির মতো। যদিও আমার ইন্টারনেটের সুবিধা আছে কিন্তু বই পড়ার মতো আনন্দ হয় না, যেটা আমি হাতে ধরতে পারি, আমার আঙুল চালিয়ে পাতা ওল্টাতে পারি। আমি নতুন প্রকাশিত বইয়ের গন্ধ নাকে শুঁকতে পারলে বেশ আনন্দ পাই। ইন্টারনেট এবং বই—দুই-ই পৃথিবীটাকে উন্মুক্ত করে দেয়। আমি টিভিতে মুভীও দেখি কখনো সকনো। আর ফোনে অসংখ্য মানুষের কথার জবাব দেরার মধ্যে আমি তাদের নৈকট্য লাভ করি।

আমার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমি খানিকটা সময় বার করে নিই, রঙ আর ব্রাশ নিয়ে সাদা কাগজের বুকে রঙের ছোপ লাগাই। আমার দুটি আঁখি তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। পেন্টিং আপনাকে একটা রামধনুর স্বর্গে পৌঁছে দেবে সেখানে সফেন চন্দ্রমা, উজ্জ্বল সূর্যোদয়, কিম্বা রবির ক্ষীণ প্রভার বিকীরণ বিচ্ছুরিত হবে।

এর পরেও নিঃসঙ্গতা? হতে পারে। আমি আমাদের পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষরাজি ভরা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করে ক্যাম্পাসে একটু পায়চারি করি। আমি দেখি সোনালি চাঁদ কিম্বা রূপোলি তারকারাশি ওপরে সুদূরে মিটমিট করে জ্বলছে। যখন আমি ঘরে ফিরে আসি, আমি ডায়েরীর পাতায় অনেক কথা লিখি। আমি অনেক জিনিস পূরণ করি। আমি গেয়ে উঠি—যখন তোমার মনটা খারাপ থেকে তখন তুমি সুখী হবার ভান করো। এটা করা খুব কঠিন নয়। তুমি দেখবে সুখের শেষ নেই, যখন তুমি সুখীর ভান করবে।

বিদ্যায় নিঃসঙ্গতা

আমি স্বপ্ন দেখি হাওয়াই, ইজিপ্ট, জাপান, লক্ষ্ণৌ, কেরলে অনেক দিন যেন আছি। এমনকি আপনি ওই সমস্ত জায়গা ঘুরে ফিরে এলেও সেইসব দিনের সুখস্মৃতি আপনার পিছু ছাড়বে না। সুখের দিনগুলির স্মৃতি অনেকদিন সঞ্জীবিত থাকে। মানুষের জীবনের দুটি অসাধারণ সুন্দর উপহার হল স্মৃতি আর কল্পনাশক্তি।

ডায়েটিশিয়ানরা লিভারের পক্ষে ভালো না বলে অনুমোদন করেন না। এইভাবে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা
করতে পারেন। সময় আর সামর্থ্য বাঁচিয়ে পড়াশুনো করতে পারেন, লিখতে পারেন, আপনার হবির
পিছনে ছুটতে পারেন। লাঞ্চে আপনি বাড়িপাতা চিনি ছাড়া দই খান। বেড-টি আর দু-তিনটে সহজে হজম
হয় এমন বিস্কুট খেতে পারেন। এতে সময় বিশেষ নষ্ট হয় না। তারপরে সকালের জলখাবার। লাঞ্চের
মেনুটাই ডিনারে রিপিট করুন। যদি মাছ খান তাহলে চিকেনটা ছাড়ুন। আমার জন্য লাঞ্চে মাত্র এককাপ
ভাত বরাদ্দ, রাত্রেও এককাপ ভাত। মশলাদার রিচ খাবার নাই বা খেলেন। আসলে হাঙ্গার ইজ দ্য বেস্ট
সস—খিদেই খাওয়ার আসল মজা। লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম নিন। রাত্রে খাবার পর খানিকক্ষণ হাঁটুন।
তবে খিদে বৃদ্ধির জন্য অনেকটাই আমি হাঁটি। ওটাই জীবনের মশলা।

আমি জমাদারকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। সে অ্যাসিড নিয়ে যা করে, কি আর বলবো। টয়লেটের বারোটা
বাজায় ঠিকমতো পরিষ্কারের পরিবর্তে। ফ্লোরের আর দেওয়ালের টাইলগুলো নষ্ট করে, বেশি অ্যাসিড
আর হারপিক ব্যবহার করে। আমি অনায়াসে স্নানের পর শাওয়ার পাইপ দিয়ে বাথরুমের দেয়ালগুলো
ধুয়ে ফেলি। আজকাল প্লাস্টিক বোতল পাওয়া যায়। আপনার ঢালার দরকার নেই, চাপলেই হলো। আমি
বাথটাব পরিস্কারের ভয়ে ব্যবহার করি না, সেটা একটা পিঠ মোচড়ানো কাজ। টয়লেটে শাওয়ারই যথেষ্ট।
ফ্লাশে কাজ হয়। হারপিক দিয়ে রাখলে সকালে সামান্য ব্রাশ দিয়ে সামান্য ঘষাঘষিকরলেই হলো। স্নানের
পর ফ্লোরটা মোছাও খুব সহজ। তারপর কেবিন ফ্যানের সুইচ টিপুন, ফোর শুকনো রাখার জন্য। যদিও
এতে বেশ খরচ আছে।

আমি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেবার পর আমার গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। কারণ এখন আর আমি গাড়ি চালাতে পারি না আর একজন ড্রাইভার রাখারও দরকার নেই। জীবনের এই পর্যায়ে একটা গাড়ি রাখা মাথার যন্ত্রণা বটে। বিশেষ করে তুমি যখন একাকী বাস করো। একজন ড্রাইভার রাখা অনাবশ্যক খরচ বাড়ানো। যদিও আমার কর্মক্ষেত্রে এখন আর নিয়মিত উপস্থিত হতে হয় না, তবে আমাকে অনেক সভা সেমিনারে যেতে হয়। এসব সময়ে একটা ভাড়ার গাড়ি ব্যবহার করা বরং সুবিধাজনক। তাছাড়া সভা-সেমিনারের সংগঠকরা আমাকে ঘর থেকে নিয়ে যায় আবার পৌঁছে দিয়ে যায়। যদিও এখন আমার নিজের গাড়ি নেই, তাই বলে বাইরে বেড়ানো, ঘোরাঘুরি বন্ধ নেই। একটা ভাড়ার গাড়ি নিয়ে আমি সামাজিক অনুষ্ঠান এবং পার্টিতে যাই। এই জীবনশৈলী আমি বেছে নিয়েছি, এতে প্রচুর স্বাধীনতা আছে। আর আমি দুঃশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারি। এতে আপনি প্রচুর সময় নিজের হাতে পাবেন। আপনি অবসর সময়গুলো উপভোগ করবেন এবং আপনার নিঃসঙ্গতার বালাই থাকবে না।

রাত্রে শুতে যাবার আগে যেসব বন্ধুরা-আত্মীয়রা দূরে থাকে তাদের gmail পাঠান। আমি এক আঙুল দিয়ে টাইপ করি, তাই আমার একটু সময় লাগে। তবে চিঠি যত বড়ো হয় ততই ভালো। আমি গান চালিয়ে নিয়ে লম্বা চিঠিগুলো লিখি। আমি দেখেছি gmail থেকে চিঠিই ভালো। চিঠিতে একটা ব্যক্তিগত স্পর্শ থাকে। আর আপনার হস্তাক্ষর যদি পাঠযোগ্য আর সুন্দর হয় তাহলে কী দারুন হয় সে আর কী বলবো। আর যদি প্রেম-পত্র লেখেন তাহলে চিত্রিত লেটার ব্যবহার করুন। তাতে একটু সেন্ট মাখিয়ে দিন। (অবশ্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে যে চিঠি লিখবেন তাতে যেন লাগাবেন না।) জবাবী খামগুলো

কামাই করে। যেহেতু আমি একা থাকি, ওরা সেই সুযোগটা নেবার চেষ্টা করে। ওদের ওপর সবসময় তদারকির দরকার। ওদের ব্যবহারও রুক্ষ।

ওয়াশিং মেশিন আমি ব্যবহার করি না। তিনজন ধোবী আমার ঘরের পর্দা, ঝাড়ন, রুমাল, ট্রে ঢাকনা, চা-দানী কভার, এমনকি ডোরম্যাট কাচাকাচি করে। আমার সাতদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয় না, কারণ ওরা তিনজন। সিল্ক আর গরম পোষাকগুলো লন্ড্রীতে পাঠিয়ে দিই ড্রাইওয়াশের জন। ওয়াশিং মেসিনে তো আর সব কাজ হয় না। কাপড় চোপড় শুকানো, মাড় দেওয়া, নীল লাগানো, আয়রন করা ঢাকাই সিল্ক আর বেনারসী শাড়িগুলো কী করি?

হ্যাঁ, আমার কারো সাহায্যের দরকার হয় না। আমি প্রচুর স্বাধীনতা, শান্তি, স্বস্তিতে ও একান্ত আপন সময়টুকু উপভোগ করি আমার হবিগুলোর পেছনে। আমার সৃজনশীল কাজের জন্য প্রচুর সময় আমি এভাবে হাতে পাই।

কেবল আমার পড়ার ঘরটা খোঁয়াড়ের মতো লাগে। সেখানে বইয়ের জঙ্গল, কাগজপত্র, ম্যাগাজিন, পেপার-কাটিং, ফাইল, টেপ রেকর্ডার, টু-ইন-ওয়ান, রেকর্ড প্লেয়ার, সি.ডি. প্লেয়ার আমার ওই ছোট্ট ঘরটাতে ঠাসা আছে। ক্যামেরা, আঁকার জিনিসপত্র ওই ঘরটাতেই ঠাসাঠাসি করে রেখেছি। আমার গান শোনার যাবতীয় যন্ত্রপাতির জন্য আলাদা কোনো মিউজিক রুম নেই। অ্যালবামগুলো, ফটো-টটো, ডাক-টিকিট, কয়েন, এসব ওই পড়ার ঘরেই গাদাগাদি করে রেখেছি। বহু ছেঁড়া-খোড়া বই ওই জঙ্গলের মধ্যে স্তুপাকারে আছে। ওটাই আমার "স্টাডি" যাকে বলে। আরো অনেক বই আছে, ওগুলো আর "স্টাডির" মধ্যে ধরছে না।

কিন্তু ওই যে প্রত্যেক রাত্রিতে আমার বেডটা নিজেকে তৈরী করে নিতে হয় আর মশারি টাঙানোটা আমার ভীষণ একটা অপছন্দের কাজ।

একটা কথা জানাতে ভুলে গেছি। আপনি কিন্তু কিচেনকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারবেন না। সকালের জলখাবারের জন্য কী করবেন? হ্যাঁ, আমি এটাকে একদম সরল করে নিয়েছি। প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে নিই, ছানা তৈরীর জন্য। তারপর ওই পাত্রে কোয়েকার ওট এক চিমটে নুন দিয়ে বানিয়ে নিই। তারপর একই পাত্রে ছোলা সেদ্ধ করে নিই। তারপর প্রুটিন সয়া চাঙ্ক সেদ্ধ করে নিই। এই চারটে জিনিস সেদ্ধ করার পর বাসনকোসন হ্যান্ডলওয়ালা স্কচব্রাইট দিয়ে ধোয়াধুয়ি করে নিই। এগুলো করতে অতি অল্প সময় আর পরিশ্রম লাগে। পরদিন সকালে টোস্টারে স্লাইস রুটি সেঁকে নিয়ে আধ চামচের মতো মাখন লাগিয়ে নিই। তারপরে ছানা আর আপেল। এটা খোসা ছাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। শুদু কাটো আর খাও। এটা স্বাদ বদলের জন্য একদিন অন্তর অন্তর করি। লাঞ্চে দু-পিস বোনলেস চিকেন, শাকসবজি, নুন, মরিচগুঁড়ো, ভিনিগার আর মশলা দিয়ে মাখিয়ে খেয়ে নিই। কোন তেল মাখন ছাড়া - যাতে কোলেস্টরেলের জন্য হার্টের কোনো ক্ষতি না হয়। সন্ধেয় ছোলা সেদ্ধ দিয়ে মুড়ি আর শশা। সকালেই ওটা করা থাকে। এই চার্টটা আমার ডায়েটিশিয়ান আমার জন্য করে দিয়েছেন। আমি মাছ খাই, রেস্টুরেন্ট থেকে ডাল সবজি মাছের কারিসহ আসে। এগুলোতে প্রচুর প্রোটিন আছে আর একজন ডায়াবেটিক রোগীর জন্য আদর্শ খাবার। যদিও অতটা সুস্বাদু হয় না। আপনার লুচি, পরোটা, পিঠে করার দরকার নেই। এগুলো

—ঃঃ নিঃসঙ্গতামুক্ত একাকিনী প্রবীণার প্রাত্যহিকী ঃঃ—

নার্গিস সাত্তার

স্বচ্ছন্দ ভাষান্তর—জি. এম. আবুবকর

আমি একটি অদ্ভুত মানুষ। অনেক লোক আমাকে তাই-ই ভাবে। কেন, আমি অদ্ভুত কেন? কারণ, জীবনযাপনের পরিচিত পথে আমি হাঁটিনি। আমার জীবনকে আমি বিশুদ্ধ পথে নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়েছি। নিজেকে আমি নিঃসঙ্গ আদৌ মনে করি না।কিন্তু হ্যাঁ, আমি একজন একাকিনী প্রবীণা।

আমি বাইরে থেকে আমার জন্য লাঞ্চ অর্ডার দিয়ে আনাই। সুতরাং আমার রান্নার পাঠ নেই। শুধু চা, কফি, পানীয় আমি তৈরী করি। চিকেন আর শাকসবজি সেদ্ধ করি। বাকি সবকিছু আসে রেস্টুরেন্ট থেকে। সবই আমার দরজায় গোড়ায় দিয়ে যায়। আমি মাছ রান্না পরিহার করি, ওটা সেদ্ধ করা যায় না। ডিম সেদ্ধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার এলার্জি আছে। তাছাড়া, মাছ রান্না করতে অনেকটা সময় লাগে। তাছাড়াও মাছ ধুয়ে বাছতে গেলে অনেকটা সময় লাগে। তার থেকে বোনলেস চিকেন ভালো। সুতরাং কিচেনে সময় নষ্ট হচ্ছে না। আমার বোন চায়না প্লেট, গ্লাস, চামচ এবং কাপ ও সসার ধোবার জন্য আমি একটা হ্যান্ডেলওয়ালা স্কচব্রাইট ব্যবহার করি। এভাবে আমার শখের কাজগুলির পেছনে সময় ব্যয় করার জন্য অবকাশ পাই। আমার সময়টা সুখের সঙ্গে বেশ হিসেব করে খরচ করতে পারি।

নিঃসঙ্গতাকে আমি দূরে ভাগিয়ে দিয়েছি। আমার "Simmermatic" টার জন্য আমার অনেকটা সময় বেঁচে যায়। কারণ, এই যন্ত্রে রান্নাটা আপনা আপনি অর্থাৎ automatically হয়ে যায়। শুধু timer কে ব্যবহার করুন। আপনি যখন বাইরে আছেন, আপনার জন সিম্যরম্যাটিক রান্না করে দেবে। আপনি রাত্রে যখন ঘুমে আচ্ছন্ন সিমরমেটিক আপনার জন্য রান্না করে দেবে। সকালে দেখলেন আপনার খাবার তৈরী। কিন্তু সময়টা ঠিকঠাক adjust করে নিতে ভুলবেন না। আসলে এটা একটা ইলেকট্রিক কুকার। আপনার তদারকির দরকার নেই, ওর ওপর সবসময় লক্ষ্যদিতেও হবে না। শুধু সুইচটা অফ আর অন করুন। সুতরাং সময় আপনার নষ্ট হচ্ছে না, এটাকে ব্যবহার করুন। আপনার খাবার পুড়বে না। কিন্তু টাইমারটাকে ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সবচেয়ে কম সময় লাগে আধঘণ্টা, সবচাইতে বেশি সময় লাগে বারো ঘণ্টা। আপনি এখান থেকে বর্ধমানে বেড়াতে যান আর বারো ঘণ্টা পরে ফিরে আসুন। এসে দেখবেন, আপনার খাবার পুড়ে যায়নি। আপনার খিদে মেটানোর জন্য খাবার তৈরী। এটা খুবই নিরাপদ। আপনি নিশ্চিন্তে কাজে বেরিয়ে যান। সিমারমেটিক আপনাকে রিলাক্স করায় সাহায্য করবে। কারেন্টও বেশি খরচ হয় না।

আমার রাঁধুনীর দরকার হয় না। রাঁধুনীরা প্রায়ই অপরিচ্ছন্ন থাকে। ওদের ওপর সর্বক্ষণ নজরদারি করতে হয়। এতে আপনার চিন্তাশীলতার কাজ ভীষণ ব্যাহত হয়। একই কথা খাটে কাজের মাসীর ক্ষেত্রেও। ওদের ছুটির নিশ্চয় দরকার আছে। কিন্তু ওরা মাঝে মাঝে কামাই করে নিজের ইচ্ছেমত। ওরা কখনো সময়ে আসে না। ওরা নির্ধারিত ছুটি শেষ হবার পরেও কাজে আসে না। এবং না জানিয়ে দিনের পর দিন

—ঃঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঃঃ—

অভিক বসু

পথ ঢেকে যায় ফুলে ফুলে
রঙিন আলপনাতে
মৌন মিছিল বর্ণমালা
একেক জনের হাতে
পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা
একুশের প্রভাতে।
যাচ্ছে কোথায় ওরা
হাতে ফুলের তোড়া
শোন তবে দু চার কথা
এই প্রভাতেই বলি
চারখানি ফুল ফোটার আগেই
পড়ল ঝরে কলি।

ব্রিটিশ শাসন শেষ হয়েছে
স্বাধীনতার স্বাদ
শাসক বলে উর্দু চাপাও
বাংলা ভাষা বাদ
জ্বলল আগুন পাকিস্তানে
বাংলা ভাষার অমোঘ টানে
প্রবল প্রতিঘাত।
শাসক বলে চালাও গুলি
মেঘ যমুনা কর্ণফুলি
রক্তে হলো লাল
৫২ সেই সাল

চলল গুলি দুম দামাদাম
লুটিয়ে পড়ে রফিক সালাম
বরকত জব্বর
থামে না বর্বর
তরতাজা প্রাণ পড়ল ঢোলে
বাংলা ভাষার মাতৃ কোলে
নিছক বলিদান
মাতৃভাষা মায়ের ভাষা
সেই ভাষাতেই কাঁদা হাসা
আজ একুশে সালাম তোমায়
জানাই সম্মান।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক

জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবন
৯০/১, পি. জি. এইচ শাহ রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৫
যোগাযোগ - ০৩৩-২৪৭৩ ৯৬৪২ / ৯৬৭৪৫৫৩৪৭৭ / ৯৪৩৩৭৯৭০৫৮

সুলভে আধুনিক ফিজিওথেরাপী -

ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের
প্রতিদিন - সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

সুলভে আকুপাংচার (যোগাযোগ সাপেক্ষে)

- ডাক্তার চেম্বার -

অর্থোপেডিক -

১) ডাঃ অমল ঘোষ, MBBS, DSM (Ortho, Surgeon)
মঙ্গলবার - সন্ধ্যা ৬টা
২) ডাঃ মিষ্টুন ব্যনার্জী, MBBS, DNB (Ortho)
শনিবার - বেলা ১টা

হোমিওপ্যাথ -

১) ডাঃ আলপনা সোম, BSC, DMS
বুধবার - বিকাল ৫টা
২) ডাঃ সুশীল কুমার দাস, BSC, DMS
শুক্রবার - বিকাল ৪টা
৩) ডাঃ অনিন্দ্য দেবনাথ, BHMS, (MSc. Psychology)
শনিবার - বেলা ১১টা

—ঃঃ অমর একুশে বিজয় সরণি ঃঃ—

মৃণাল দত্ত

অনাগত দিন। প্রতীক্ষা সারা দিন সারা রাত
এই বাংলার ঝিলপাড়ে শাপলা পাতায় ঝিনুকে
দিকে দিকে প্রস্তুতি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে
শাসকের অবিমৃশ্য অহংকারে জেগে উঠেছিল
প্রতিস্পর্ধী মুষ্টিবদ্ধ হাত। প্রতিজ্ঞা ছিল আমরণ
মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ শহর ...
সংকল্পিত দাবীর বিরুদ্ধে লাঠিগুলি
রাজপথে রক্ত ঝরে রফিকের বরকতের সালামের
অবশেষে মায়ের শুচিস্নিগ্ধ মুখশ্রী
করুণার মতো হাসে

ভাষা জননীর ছেলেরা আলপনা এঁকেছিল
রমলার প্রান্তরে ফাল্গুনের সকাল সন্ধ্যায় ...

এখনো অনেক বাকী বিজয়ের
ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে মায়ের অসুখী মুখ
বিদেশী ভাষায় মগ্ন দাম্ভিক নারী ও পুরুষ
তাহলে আসুক আবার ৮-ই ফাল্গুন
কৃষ্ণচূড়ার রক্তিমে বাজুক শপথের বসন্তগান
বন্দি বিবেকের রুদ্ধ হৃদয়ে রক্ত ঝরুক
রক্তপথে সন্তানের মুখে দেবে
মাতৃবর্ণমালার শুদ্ধ উচ্চারণ
অ আ ক খ উচ্চারণ তো মাতৃসুধাপান যেন
শিশির ঝরা সকালে গোলাপের সুবাস॥

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

১লা এপ্রিল থেকে ২০২০-২১ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। সদস্য পদ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিয়ে অনতিবিলম্বে নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দুরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৯টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য-এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধে ৭টা-৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন ____________

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

৬) নিকটাত্মীয় বা যে কোন ব্যক্তি যাতে প্রবীণ-প্রবীণাদের দৈহিক ও মানসিকভাবে পীড়ন না করেন, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। এর জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা প্রয়োজন।

৭) সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা একাকী এমন মানুষের জন্য বৃদ্ধাবাস জরুরী, যেখানে তাঁরা সম্মান ও শ্রদ্ধা নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করতে পারেন। এরজন্য সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সেখানে থাকবে ফুল-ফল-সবজি বাগান এবং ছোটদের বিদ্যালয়। প্রবীণরা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবেন এই আবাসে। সকল কাজেই নিযুক্ত হবেন। এর মাধ্যমে এক আদর্শ আবাস গড়ে উঠবে।

৮) প্রতিটি সুস্থ-সবল প্রবীণ-প্রবীণারা যাতে নিজেকে কাজে ব্যপৃত রাখতে পারেন সরকার অবশ্যই তার ব্যবস্থা করবেন। এর দ্বারা তাঁদের শরীর-মন ভালো থাকবে, দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।

৯) প্রতিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প 'দিবা সেবা কেন্দ্র' (Day Care Centre) স্থাপন করতে হবে। এই সকল কেন্দ্রে কাজের মূল্যায়ন করবেন প্রবীণ ব্যক্তিরা। সেখানে কাজের সুযোগ, অবসর বিনোদন ও ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।

১০) সার্বিকভাবে প্রবীণদের অভাব অভিযোগ দেখার জন্য যদি একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা যায়, ন্যায় বিচার ত্বরান্বিত হবে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় কেবল গরীব অশিক্ষিতরাই নয়, তথাকথিত উচ্চপদে আসীন আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত ব্যক্তিরাও প্রবীণ-প্রবীণাদের যথেষ্ট অনাদর ও অবহেলা করে থাকেন। আজকাল এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। এর প্রতিকারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

এখানে কয়েকটি মাত্র মত ও পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও অনেক কাজ করতে হবে; তা পরিপূর্ণরূপে স্থির করবে উপরিউক্ত সরকারী কমিটি।

আর পরিশেষে বলতে পারি এর জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সরকার যদি Social Security Scheme বা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী রূপায়ন বাবদ সকল রোজগেরে মানুষের উপর অতিরিক্ত কেবল শতকরা একভাগ মাত্র কর আরোপ করেন, এই অর্থের সংস্থান হবে। উন্নত দেশগুলিতে এই পথ নেওয়া হয়ে থাকে। ভারত একটি উন্নত দেশ, আর পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলা এক সম্ভাবনাময় অঙ্গ রাজ্য। এই রাজ্য উন্নয়নমূলক কাজে অবশ্যই সামিল হবে এই আশা করা যায়।

মনে রাখতে হবে প্রবীণরা আমাদের সমাজ ও দেশের জাতীয় সম্পদ। এদের সার্বিক উন্নয়ন ও ভালো রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কেবল একটি দিন বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে আমাদের দায়িত্ব যেন ফুরিয়ে না যায়, তা বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে।

একান্ত প্রয়োজন। এটির অভাবে পরিকল্পনা কার্যকরী ও বাস্তবায়িত হওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। যদি এমন ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন যে প্রবীণ মানুষের সমস্যাকে উচ্চ অগ্রাধিকার নিয়ে ভাবা হবে এবং কাজ করা হবে, তাহলে সাফল্য আশা করা যায়।

তার জন্য এখনই একটি কমিটি গঠন করে তাদের নির্দেশিত মত ও পথকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই কমিটি গঠন করা যেতে পারে রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, প্রাক্তন বিচারপতি, আইনমন্ত্রক, আবাসন ও পরিবেশ দপ্তর, পুলিশ ও সংস্কৃতি দপ্তর, কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায়। প্রাক্তন আধিকারিকদের এর সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্য তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। এই কমিটি তিন মাসের মধ্যে তাদের সুচিন্তিত অভিমত পেশ করবেন সংশ্লিষ্ট সমাজ কল্যাণ মন্ত্রককে এবং রাজ্য সরকার নীতি নির্ধারণ করে আরও তিন মাস সময় নিয়ে কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে প্রবীণ-প্রবীণাদের সার্বিক কল্যাণের রূপরেখাটি রচিত হবে এবং অবিলম্বে কাজ শুরু করার দৃঢ় অঙ্গীকার ও পদক্ষেপ নেওয়া হবে. রাজ্য সরকার এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে এক বিরাট সংখ্যক অবহেলিত অনাদৃত প্রবীণ মানুষের উপকার সাধিত হবে, দেশেরও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য প্রবীণ নীতি (National Policy for older Persons) অবিলম্বে কার্যকর করা প্রয়োজন, যা স্বাধীনতার পর থেকে প্রণয়ন করা হয়নি।

এক্ষেত্রে দশটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে ঃ

১) যানবাহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ঃ অভিভাবক সহ শিশুদের ও প্রবীণদের জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা; প্রতিটি যানবাহনে স্থানীয় বা দূরে যাত্রার জন্য শিশু ও বৃদ্ধদের আসন সংরক্ষিত রাখা। এই ব্যবস্থা বাস, ট্রাম, ট্রেন, লঞ্চ ও রেল প্রভৃতি যানে রাখতে হবে, শতকরা অন্ততঃ দশজনের। শিশু ও বৃদ্ধদের ভাড়া অর্ধেক করা প্রয়োজন।

২) প্রতিটি দারিদ্র সীমার নীচের প্রবীণ মানুষকে তাদের বাঁচার জন্য অন্ততঃ ছয় হাজার টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া একান্ত জরুরী।

৩) পারিবারিক হিংসা ও শোষণ থেকে যাতে প্রবীণ-প্রবীণরা মুক্ত হতে পারেন তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এজন্য থানাস্তরে বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে সবল দুর্বলকে শোষণ করবে না। তার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে এক সপ্তাহের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে।

৪) পুত্র-কন্যা এবং নাতী-নাতনীরা পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য থাকবেন। এর জন্য প্রয়োজনে তাদের আয় থেকে মাসিক হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে বাধ্যতামূলক ভাবে, আইনেও সেই সংস্থান করা থাকবে।

৫) প্রবীণরা তাদের বিষয় সম্পত্তি ও অর্থ কোন পরিস্থিতিতেই হস্তান্তর না করেন, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। তাঁরা ভবিষ্যতে যেন নিঃস্ব না হয়ে পড়েন।

৩। প্রবীণ-প্রবীণাদের বর্ধিত মাত্রায় কর ছাড় দেবার ব্যবস্থার সুপারিশ—

৪। স্বাবলম্বী সন্তান পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে যাতে পিতামাতার ভরণপোষণে দায়বদ্ধ হয়, তার জন্য প্রত্যেক রাজ্য সরকার উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করবেন। আইনটি যাতে ঠিকভাবে পালিত হয়, তার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

খ) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন :

প্রবীণদের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা। প্রবীণগণ যেন হাসপাতালে উপযুক্ত সেবা-যত্ন লাভ করেন, দীর্ঘ সময় যেন অপেক্ষা করতে না হয় এবং চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে (ward) না ঘুরতে হয়। এর জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে (Geriatric ward) জেরিয়াট্রিক ওয়ার্ড চালু রাখা ও বয়স্কদের স্বাস্থ্য কার্ডের ব্যবস্থা করা। ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা প্রসারিত করা, গরীব বসতি এলাকার জন্য এই পরিষেবা বিশেষ জরুরী।

গ) প্রবীণদের বাসস্থানের ব্যবস্থা :

ইন্দিরা আবাস যোজনা সহ অন্য সকল গৃহনির্মাণ প্রকল্পে প্রবীণদের মধ্যে নিম্ন আয়ভুক্ত মানুষের জন্য দশভাগ সংরক্ষিত করা, গৃহ ঋণের ব্যবস্থা সরলীকরণ, বহুতল আবাসে প্রবীণদের জন্য নীচের তলায় ফ্ল্যাট রাখার ব্যবস্থা।

ঘ) দুর্বল প্রবীণদের অগ্রাধিকার প্রদান :

দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, রোগপ্রবণ, অশক্ত, পরিবারহীন বা একক প্রবীণদের চিহ্নিত করণ, তাঁদের সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান ও সহায়তা দান এবং প্রবীণদের উন্নয়নকল্পে তহবিল গঠন একান্ত প্রয়োজন।

ঙ) নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে সংহতি সাধনের জন্য নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ-এর দ্বারা নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে আন্তরিকতার প্রসার হবে, সম্পর্কের উন্নতি হবে। জীবনে মূল্যবোধ সৃষ্টির পথে অগ্রসর হওয়া যাবে।

চ) প্রবীণদের মধ্যে বিশাল অভিজ্ঞতা ও শক্তি সংরক্ষিত আছে সেগুলি উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। তাদের দক্ষতা, জ্ঞান, যোগ্যতা ও বিপুল অভিজ্ঞতা দ্বারা সমাজ যাতে সমৃদ্ধ হয় তার ব্যবস্থা করা। প্রবীণদের কাজের মধ্যে নিয়োজিত করলে সমাজ ও রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হবে। এর ফলে তাঁরাও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন ও আনন্দলাভ করবেন। প্রয়োজন কেবল যথাযথ সম্মান, সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা রাখা।

National Council for Older Person (প্রবীণ নাগরিকদের জন্য জাতীয় পরিষদ) :

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার ও অধিকারদান মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত করা হয়েছে এই জাতীয় পরিষদ। এই পরিষদের কাজের পরিধি হবে প্রবীণ নাগরিকদের জাতীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রয়োগ সুরক্ষা ও প্রবীণ মানুষের প্রয়োজনে যে কোন কাজ গ্রহণ করা।

সরকারী বহুবিধ ব্যবস্থা আছে কিন্তু তার সফল রূপায়নে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মতৎপরতা

সংস্থার পক্ষ থেকে পূজালি পৌরসভার নেতাজী পার্ক-এ পিকনিকে অংশগ্রহণকারী সদস্য বৃন্দ

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত-এর দ্বি-শত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সংস্থার ডাক্তার বাবুদের সম্মাননা জানানো হয়

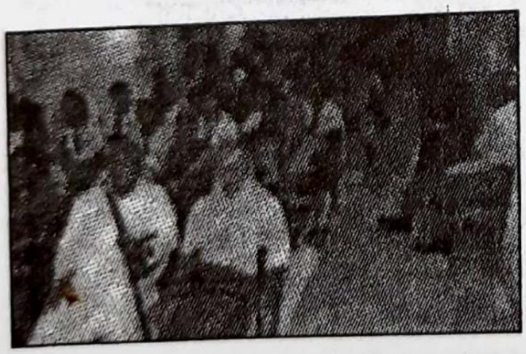

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত-এর দ্বি-শত বর্ষ পালন অনুষ্ঠানে রামমোহন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দ

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- Bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatrics.in

শ্রদ্ধায় স্মরণে

কৃষ্ণা বসু

জন্ম ঃ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩০
মৃত্যু ঃ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২০

সম্প্রতি সংস্থার ৩ জন সদস্যবৃন্দ প্রয়াত হয়েছেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী

অমল মান্না
প্রদীপ সাহা
অশোক কুমার দত্ত

যায় না। যেতে যেতে পড়ল মালাবাড়ি জঙ্গল। এখান থেকে শীলদা মার্কেট হয়ে বেলপাহাড়ীর রাস্তা। বেলপাহাড়ী ব্লক অফিস থেকে ১০ কিমি দূরে ঘাঘরা ফলস্। চারিদিকে ঘন জঙ্গল আর পাথরের মধ্য দিয়ে হাঁটা। বিরামহীন জলস্রোত পাথরের মধ্য দিয়ে অবিরাম শব্দে বয়ে চলেছে। এর উৎসস্থল অজানা। এখান থেকে ৫ কিমি দূরে তারাফেনি ও কংসবতী উপনদী। এখানে চাষের সুবিধার জন্য আছে একটি ড্যাম। এই ড্যামটির নাম হাতীডোবা ড্যাম। ড্যামের মধ্যে রয়েছে অসংখ্যা জালি। তাতেই হাতী পড়ে আটকে মারা যায়। তাই এর নাম হাতীডোবা ড্যাম। এর পরেই খান্দারানী লেক। এখানে মহুয়া গাছের জঙ্গল আছে। এখান থেকে ১০ কিমি দূরে লালজল এখানে পাহাড়ের একটি নির্জন গুহায় থাকতেন রামস্বরূপ দেব শর্মা নামে এক সাধু। এখানে তিনি ধ্যানে বসে সিদ্ধিলাভ করেন। এখান থেকে বেলপাহাড়ী এসে লঞ্চ করে, ১৩ কিমি দূরে গেলাম কাঁকড়াঝোড় এবং কেটকি লেক। এখানে আছে আদিবাসীদের গ্রাম। গ্রামের নাম ধাংড়িকুসুম। অপূর্ব কারুকার্য্য করা সুন্দর সুন্দর মাটির বাড়ী। খুবই সহজ সরল এই আদিবাসীরা। এদের জীবিকা হল পাথর কেটে ঘরে বসে বিভিন্ন জিনিষ তৈরি করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে। অন্য সময় চাষবাসও করে। এদের আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সন্ধে নাগাদ ফিরে এলাম রিসর্টে। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে সকাল ৯ টায় কলকাতা রওনা দিলাম। পেছনে পড়ে রইল অনেক স্মৃতি, অবসর সময়ে রোমন্থনের জন্য।

—ঃঃ সম্পাদকীয় ঃঃ—

২০০৫ সালের ১৩ মার্চ। মহান মানবতাবাদী ডাঃ হেনরী নর্মান বেথুন এর পূণ্য নামে আমাদের পথ-প্রদর্শক শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জী ও অন্যতম দিগ্‌দর্শক হরিদাস মালাকার এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য প্রবীণদের কল্যাণ সাধন। তাঁদের প্রদর্শিত পথে সকলের সহযোগিতায় আমরা এগিয়ে চলেছি।

আমাদের দেশের প্রবীণরা আর্থিক, শারীরিক, সামাজিক, মানসিক প্রভৃতি নানা সমস্যায় জর্জরিত। মূল সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ ও সেগুলি নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রবীণকল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী সনদ পেশ করা হবে। আশা রাখি সবাই সমর্থন করবেন এবং সোচ্চার হবেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে CAA—NPR—NRC নিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে। দেশের রাজধানী-দিল্লিতে ঘটেছে জঘন্যতম ঘটনা। ৪৬ জন (১ মার্চ পর্যন্ত) প্রাণ হারিয়েছেন। স্বজনহারাদের হাহাকারের সঙ্গে আমরাও ক্রন্দনরত। দ্রুত সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা। সরকার সব কা সাথ, সব কা বিশ্বাস (!) অর্জন করুক।

সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

—ঃঃ ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ী ভ্রমণ ঃঃ—

করবী লাহিড়ী

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

ভ্রমণ মানুষের নেশা। আমরাও এর বাইরে নয়। আমরা অনেক দূরে দূরে বেড়াতে গেছি দেশ ও বিদেশে। তবু যেন মনে হয় এই বৃহৎ ভারতবর্ষে এমনকি পশ্চিমবঙ্গে এমন জায়গা আছে যা আমরা দেখিনি অদেখা রয়ে গেছে। তাই তিন দিনের জন চলে গেলাম, মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি দেখেতে। 'ঝাড়গ্রাম লালমাটি'র জায়গা। ১৭।১২।১৯ তারিখে গাড়ি নিয়ে আমরা ৫ জন বেরিয়ে গেলাম। বেলা দুটোয় আমরা ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি পৌঁছালাম। রিসর্টের চাবি নিয়ে মালপত্র রেখে, ঐ দিন বিকেলে দেখতে গেলাম চিল্কিহদ ও কনক দুর্গার মন্দির। ম্যানেজারের কাছ থেকে যাওয়ার রাস্তা জেনে নিল ড্রাইভার। রাজবাড়ী থেকে এর দূরত্ব ৮ কিমি। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে এই মন্দির। জঙ্গল এতই ঘন যে হাঁটতে গেলে গা ছম ছম করে। চারদিকে পাখিদের ঘরে ফেরার আওয়াজ, দিনের আলো নিবে সন্ধ্যা নেমে এল। আমরা দ্রুত হেঁটে মন্দিরে পৌঁছালাম। মন্দিরে মূর্তি দর্শন করলাম। রাতে এখানে পুলিশ পাহারায় থাকে। অসংখ্য হনুমান চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের খাবার মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ড বহন করে। মন্দির দর্শন করে ফিরে এলাম রাজবাড়িতে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে টিকিট কেটে রাজবাড়ি দেখতে গেলাম। বর্তমান রাজা এবং তাঁর ফ্যামিলি এই রাজবাড়িতে বসবাস করেন। তারই লাগোয়া রাজ্য সরকারের পরিচালনায় পর্যটকদের রিসর্ট ও রেষ্টুরেন্ট। এখানে ১০ থেকে ১২টি সুসজ্জিত রিসর্ট আছে ও পর্যটকদের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিরাট বাগান, সাজানো মনোরম জায়গা। রিসর্ট ঘিরে মাঝখানে পুকুর। শীতের সকাল আর সোনাঝরা রোদ্দুর মনকে দোলা দেয়।

পরদিন ১৮।১২।২০১৯ তারিখে সকাল নয়টায় ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা রওনা হলাম বেল পাহাড়ীতে। ম্যানেজার গাইড দিলেন। তিনি আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রথমেই পড়ল পাঁচ মাথার মোড়। এখানকার মাটি লাল এবং এটি রাঢ় অঞ্চল। এখানকার জঙ্গলের বৈশিষ্ট্য আলাদা। এখানে ৫০ থেকে ৭০টি হাতী এই জঙ্গলে দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং শহরে ঢুকেও যায়। এরপর ২য় মোড় দহিজুড় এখান থেকে ৫ কিমি দূরে পুসনির জঙ্গল। এখানে রাস্তায় দেখা গেল পর পর গরুর গাড়ি যাচ্ছে। যা এখন প্রায় দেখাই